ঊনচত্বারিংশ খণ্ড,
প্রথম সংখ্যা।

বৈশাখ, ১৩২৮

নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

৺ দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

বিষয়। লেখক। পৃষ্ঠা

কলিকাতা
২১০।৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে
শ্রীপ্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৫ই বৈশাখ, ১৩২৮

সডাক অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।] [এই সংখ্যার নগদ মূল্য পাঁচ আনা।

নব্যভারতের নিয়মাবলী

১। নব্যভারতের সডাক বার্ষিক মূল্য তিন টাকা, অগ্রিম দেয়; বৈশাখের পূর্ব্বে মূল্য প্রাপ্ত হইলেই নিয়মমত পত্রিকা প্রেরিত হইয়া থাকে।

২। বৈশাখ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়, এবং যথাসম্ভব, প্রতি বাঙ্গলা মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রতি সংখ্যা প্রকাশিত হইবে। প্রতি বৎসর রয়াল আট পেজী অন্যূন ৭২ ফর্ম্মা, ৫৭৬ পৃষ্ঠা থাকে।

৩। নব্যভারতের মূল্য ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক হিসাবে গৃহীত হয় না; বৎসর হিসাবেই দিতে হয়।

৪। বিনামূল্যে নমুনাও দিবার নিয়ম নাই।

৫। মূল্যাদি প্রেরণের বা ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সময় অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহক নম্বর লিখিবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তনের সংবাদ পরবর্ত্তী সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই দিতে হয়। তাহা না দিলে, পত্রিকা পাইতে গোল হইলে, আমরা দায়ী নহি।

৭। পত্রিকা না পাওয়ার সংবাদও পরবর্ত্তী সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই দিতে হয়। তাহার পর, সংখ্যার মূল্য দিয়া লইতে হয়।

৮। প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে ফেরত বা মতামত দেওয়া যায় না। লেখকগণ ক্ষমা করিবেন।

৯। অন্যরূপ অভিমত প্রকাশ না করিলে, বৎসরের মূল্য, জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যা ভিঃ পিঃ-যোগে প্রেরণ করিয়া, আদায় করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে অবশ্য তিন আনা বেশী খরচ।

১০। প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কোন বিজ্ঞাপনই মুদ্রিত হয় না। বিজ্ঞাপনের হার—এক বৎসরের চুক্তিতে, প্রতি লাইন (১৪ এম) প্রতিমাসে /১০; ছয় মাসের চুক্তিতে, প্রতি লাইন ৵০; তিনমাসের জন্য, প্রতি লাইন ৶০; এবং, কেবল এক মাসের জন্য, প্রতি লাইন ।০ হিসাবে মূল্য ধার্য্য করা হয়। শিরোনামা (ব্লক) বা হেডিং লাইনের জন্য যে স্থান প্রয়োজন হয়, সেই স্থানে স্মল-পাইকা দুই লেডা যত লাইন করিয়া ধরিতে পারে, তত লাইনের হারে মূল্য ধার্য্য হয়। সমস্ত মূল্যই অগ্রিম দেয়।

নব্যভারত

ঊনচত্বারিংশ খণ্ড—১৩২৮।

(প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী)

ঊনচত্বারিংশ খণ্ড—১৩২৮।

আবাহন।

ব্রজ-অঙ্গনা-আলিঙ্গনাসক্তি গোপী-অঞ্চল হইয়া মুক্ত,
ধ্বংস করিয়া কংশ অসুরে যেদিন মহিমা করিলে ব্যক্ত,
রুদ্ধ জননী উদ্ধার লাগি বাহুযোধী সনে করিলে যুদ্ধ,
হস্তে লইলে সুদর্শন চক্র, ছাড়িয়া মোহন মুরলী বাদ্য;
সেই দিন হতে ভারত-গাথায় গ্রথিত হইল নবীন সূক্ত,
সুপ্ত ভারতে লুপ্ত পাদপে নব পল্লব হইল যুক্ত।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদি, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

জরাসন্ধ ও কাল-যবনের দারুণ দম্ভ না করি গ্রাহ্য,
রৈবত-শিরে রত্নধি-তীরে তব প্রতিষ্ঠা নবীন রাজ্য।
রাজসূয়-যাগে পাণ্ডব জাগি পাইল তোমার অভয় বাক্য,
দিগ্বিজয়ী সে বাহিনী ফিরিল সকল ভারত করিয়া ঐক্য।
সমরে অটল বীর-বিক্রমী নারায়ণী সেনা তোমার সৃষ্টি,
তোমার কুহকে ক্ষত্রিয় যত জাগিয়া চাহিল মেলিয়া দৃষ্টি।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদি, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

তব ইঙ্গিতে ভারত-যুদ্ধ, তোমার মহিমা সে কুরুক্ষেত্র,
করি একত্র ক্ষত্রিয় যত রচিলে রাজ্য অতি বিচিত্র।
ধন্য তুমি হে মান্য সারথী, শক্তি তোমার ভুবনে ব্যক্ত,
তোমার তূর্য্যে আর্য্য-জাতির ছুটিল তপ্ত ধমনি-রক্ত।
প্রিয়া প্রাণাধিকা দুখিনী রাধিকা,—ত্যজিলে তাহারে মহৎ কার্য্যে,
ধন্য তব হে পুণ্য কাহিনী, মুগ্ধ ভারত তোমার শৌর্য্যে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদি, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

সুপ্ত ভারতে গুপ্ত বিভূতি দীপ্ত, পাইয়া তোমার সঙ্গ,
চিত্রক তুলি কাব্য-কাকলি বৃথা কহে তুমি চারু ত্রিভঙ্গ।
শুনেছি শ্রবণে বৃন্দা-বিপিনে মুরলীর গান ললিত ছন্দে,
প্রণয়-বিভোলা ব্রজ-কুলবালা দেখেছি ছুটিতে পরমানন্দে।
চঞ্চলা নারী অঞ্চল'পরি রচিত হেরিয়া তোমার শয্যা,
লাঞ্ছিত মোরা বঞ্চিত আজি বুঝিতে তোমার মহতি-চর্য্যা।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদি, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

যে একছত্র রচনা লাগিয়া করিয়াছ তুমি বিপুল চেষ্টা,
আজি এতদিনে ভারত ভবনে সে মহারাজ্য হ'ল প্রতিষ্ঠা।
যতেক বর্ণ জাতি ও ধর্ম্ম, স্বরাজ পুণ্য পতাকা লক্ষ্যে,
বিমল সৌখ্যে, দুঃখ ভুলিয়া, ঐক্য হয়েছে ভারত-বক্ষে।
তবু ভাঙিছেনা মোহ ঘুম ঘোর! জাগিছে না সবে সত্য-ধর্ম্মে!
ভারতের যত অজ্ঞান বাধা শেল সম মম বিঁধিছে মর্ম্মে।
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদি, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

হে পুরুষ, ওহে চতুর সারথী, চেয়ে দেখ মেলি, কমল-নেত্র,
নিকষ-নিবিড়-তিমির-জড়িত নিদ্রা-মগ্ন ভারত-ক্ষেত্র।
আবার ভারতে বাজাও শঙ্খ, রাজ্যে ধর্ম্ম কর প্রতিষ্ঠা,
শিখাও সকলে তোমার কর্ম্ম, তোমার ঐক্য, তোমার নিষ্ঠা।
কুরু-প্রাঙ্গণে বস্ত্র হরণে যে পাপ কালিমা হইল যুক্ত,
এত অপমানে, দৈন্য-দাহনে, সে কলঙ্ক কি হয় নি মুক্ত?
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নিনাদি, আবার এস হে ভারতবর্ষে,
নব জাগরণে দেহ জাগাইয়া বিপুল পুলকে অমিত হর্ষে।

শ্রীদরবেশ।

স্বরাজ।

বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। মানুষ তখন সমাজ গড়িয়া তোলে নাই। তখন রাজা প্রজা ছিল না, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানও ফুটিয়া উঠে নাই। গুহা গহ্বরে ছোট ছোট দলে মানুষ বাস করিত। পেটে ক্ষুধা ছিল, বাহুতে বল ছিল। ক্ষুধার তাড়নায় ও সবল দেহের স্ফূর্ত্তিতে দিনের বেলা শিকার করিয়া বন্য প্রাণী আনিত বা বিনা শিকারে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ফলমূল সংগ্রহ করিত, তাহাতেই ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইত। তখন ক্ষুধা পাইলে মানুষ খাইত কিন্তু তাহাকে খাদ্য কিনিতে হইত না। বিক্রয় করিবারও কেহ ছিল না। মানুষের অস্ত্র তখন ছিল পাথর, সে তখনও লোহা ব্যবহার করিতে শেখে নাই।

ক্রমে মানুষের হিংসায় রুচি কমিল; বর্ব্বরতা কমিয়া সভ্যতা দেখা দিতে লাগিল। তখনও মানুষ প্রায় বর্ব্বর ছিল। দল বাঁধিয়া বাস করিত। মাঝে মাঝে শিকার করিত। কিন্তু মানুষ দেখিল যে শিকার করিয়া পশু হত্যার অনিশ্চিত উপায় অপেক্ষা, কতকগুলি নিরীহ পশুপালন করিয়া, তাহাদিগকে সঙ্গে রাখিয়া, সেই পশুদল হইতে স্বীয় অভিরুচি ও প্রয়োজন মত আহার্য্য বা পানীয় সংগ্রহ করা, সহজ ও নিশ্চিত। ক্ষুধা পাইলে মানুষ পশুর মাংস খাইত বা পশু-দুগ্ধ পান করিত। ক্রয় বিক্রয় তখনও আরম্ভ হয় নাই। কোনও দল বা প্রধানতঃ গো-পালন করিত, কোনও দল বা প্রধানতঃ মেষ-পালন করিত। আমরা সেই গো-পালক মানুষের বংশধর। তখন সম্পত্তি বলিতে সোণা রূপা বুঝাইত না। প্রধানতঃ, পশুদলই ছিল মানুষের সম্পত্তি।

পশুপালক মানুষ পরে আরও সভ্য হইল। দল বাঁধিয়া এক জায়গায় জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, কিছুটা জমি চাষের উপযোগী করিয়া নিত। চাষের পর, অপেক্ষা করিয়া, ফসল সংগ্রহ করিত। শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে, ক্ষুধার সময় প্রয়োজন মত খাদ্য পাওয়া যাইত। মানুষ তখন লোহা ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। পশু-পালক মানুষ এবার সভ্য চাষী মানুষ হইয়াছে।

চাষ করিতে শিখিবার পরে, মানুষ যে তাহার পরিষ্কৃত আবাদী ভূমিখণ্ডের নিকট বৎসরের পর বৎসর বাসই করিত, এমন নয়। কয়েক মাস একটা জমি হইতে ফসল তুলিয়া নিয়া, হয়ত বা সেই আবাদি জমি ছাড়িয়া দিয়া, সেই মানুষ-দল অন্যত্র চলিয়া যাইত। তখন জমির অভাব ছিল না। পালিত পশু ও সঞ্চিত শস্য সঙ্গে করিয়া সে দলের অন্যত্র যাওয়া তখন তেমন দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল না। আজও ভারতবর্ষে জঙ্গলে এমন মানুষের দল আছে, যাহারা উপর্য্যুপরি দুইবৎসর একই জমি চাষ করে না। একখণ্ড ভূমি পরিষ্কার করিয়া, চাষআবাদ করিয়া, ফসল নিয়া, দলকে দল সে ভূমিখণ্ড ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

কৃষিকর্ম্ম শিখিবামাত্রই যে মানুষের সমাজ (society) বা রাষ্ট্র (state) পূর্ণাবয়বে গড়িয়া উঠিল, তাহা নয়। যখন দলকে দল মানুষ প্রায়ই একস্থান ছাড়িয়া স্থানান্তরে বাস করিতে যাইত, তখন দলপতি ছিল, রাষ্ট্রপতি ছিল না। মানুষ যখন আবাদী জমির নিকট বসবাস

করিতে লাগিল, ঘুরিয়া ফিরিয়া একই জমি বার বার আবাদ করিতে লাগিল, তখন গ্রাম্য-সমাজ আপনিই গড়িয়া উঠিল। তখন এই ভূমিখণ্ড রামের, অপর খণ্ড শ্যামের, এরূপ ছিল না। সমগ্র পল্লী বা গ্রামের অধিবাসীদের ছিল, সব জমি। চাষের ফসলও ছিল, সকল অধিবাসীর। প্রয়োজন মত যে যাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেছে ও গ্রাম্য-দলপতির আদেশ মানিয়া সাধ্যমত কাজ করিতেছে। কোনও একজন মানুষের পৃথক সম্পত্তি (private property) ছিল না। এক পল্লীসমাজে কয়েকটী পরিবার একত্র বাস করিত, তাহাদের সকলের এক দলপতি ছিলেন। আর, প্রতি পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন, পিতা। স্ত্রী-নায়ক সমাজের (matriarchal society) কথা বলিতেছি না। ভারতবর্ষে সে রূপ সমাজের লোক কমই। পিতৃনায়ক-সমাজে (patriarchal society) পরিবারের কর্ত্তা, পিতা। সেই আদিম পল্লীসমাজে, সম্পত্তি একজন পুরুষের ছিল না, ছিল সমাজের বা পরিবারের। পরিবারের সকল লোকই তাহা ভোগ করিত। সকলকেই পিতার কথা মানিয়া চলিতে হইত। না মানিলে, পিতা, পুত্রের বা মাতার, শাসন বিধান করিতেন, প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত। আজ সভ্যজগতে পিতা প্রাণদণ্ড বিধান করিতে পারেন না। সে অধিকার শুধু রাষ্ট্রপতির।

একগ্রামে চাষের পরে সময়ে সময়ে ফসল এত হইত যে, দলপতি ও নায়ক-পিতৃগণ স্বীয় পোষ্যবর্গের ক্ষুধানিবৃত্তি করিবার পরে, সঞ্চিত শস্য উদ্বৃত্ত থাকিত। উদ্বৃত্ত শস্যের বিনিময়ে, প্রয়োজনীয় অপর জিনিষ, যথা—বস্ত্র, চাষের সরঞ্জাম, ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্র প্রভৃতি—অপর গ্রাম হইতে বা স্বীয় গ্রামেরই কোনও কর্ত্তার নিকট হইতে নেওয়া হইত। এইবার বাণিজ্য আরম্ভ হইল। কেহ শস্য উৎপন্ন করিতেছে, কেহ বা মাটীর ভাঁড় তৈয়ার করিতেছে। এখন সম্পত্তি বলিতে, শুধু পশু বুঝায় না। শস্য ত সম্পত্তি বটেই; যে ভূমির পূর্ব্বে আদর ছিল না, এখন সে ভূমিও সম্পত্তি। এমন কি, যে সকল অসভ্য আদিম অধিবাসীকে দলপতি নায়ক-পিতৃগণের সাহায্যে পরাজিত ও বশীভূত করিয়া কৃষিক্ষেত্রে খাটাইয়া নিয়াছেন, সে সব শ্রমকারী মানুষও সম্পত্তি। তাহারা আর দস্যু বলিয়া নিহত হয় না। তাহারা এখন মূল্যবান্ সম্পত্তি—তাহারা দাস (slaves)।

সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে অধিকারের (rights) আবির্ভাব। কিন্তু সে অধিকার কাহার? দাসের কোনও অধিকার নাই। দাসের প্রধান লক্ষণ, দাস, মনুষ্য হইয়াও, অপর মনুষ্যের সম্পত্তি। সে নিজে সম্পত্তি লাভ করিবার বা রাখিবার অধিকারী নহে। সে নিজেই পরের সম্পত্তি। ভৃত্য ও দাস উভয়েই শ্রম করে অপরের জন্য, কিন্তু ভৃত্য অপর মনুষ্যের সম্পত্তি নহে। ভৃত্যের সম্পত্তি পাইবার ও রাখিবার অধিকার আছে। তাহার সম্পত্তির পরিমাণ যতই কম হউক তাহাতে তাহার অধিকার আছে। দাসের নাই। শ্রম করিতে স্বীকৃত হইবার পূর্ব্বে, স্বীকার করা বা না করা ভৃত্যের ইচ্ছাধীন। কার্য্যতঃ পরিমাণে যতই ক্ষুদ্র হউক, ভৃত্যের এইটুকু স্বাধীনতা আছে। দাসের নাই।

পল্লীসমাজের কথা বলিতেছিলাম। প্রথমে দলপতি সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। ক্রমে পল্লী-সমাজের আয়তন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দলপতির অধিকার কমিতে লাগিল। নায়ক

পিতৃগণের অধিকার বাড়িতে লাগিল। বাহিরের শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম, নায়ক-পিতৃগণের সাহায্য ব্যতীত, দলপতি চালাইতে পারেন না। সমাজের ভিতরেও দুরাচারীর শাসন প্রয়োজন; সে ব্যাপারেও নায়ক-পিতৃগণের সাহায্য প্রয়োজন। দলপতি, কর্ত্তা রহিলেন; কিন্তু, নায়ক-পিতৃগণ ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিমান্ হইতে লাগিলেন। নায়ক-পিতৃগণের নিজেদের মধ্যে, একদল দলপতির স্বপক্ষে, অপর একদল দলপতির বিরুদ্ধে। তখন, স্বীয় দলের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য, নায়ক-পিতৃগণ কর্ম্মক্ষম দাসদের ও সমাজবহির্ভূত বহু লোকের আদর যত্ন আরম্ভ করিলেন। তাহারা নায়ক-পিতৃগণের আদেশ পালন করিলে, নায়ক-পিতৃগণের দল শক্তিমান্ হয়। এইরূপে দলপতির প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল, নায়ক-পিতৃগণের প্রতিপত্তি বাড়িতে চলিল। দাসশূদ্রগণ অধিকারের পথে অগ্রসর হইতে চলিল।

পল্লীসমাজে দলপতির যেমন, পরিবারে তেমনই পিতার অধিকার কমিতে লাগিল। পরিবারস্থ পুরুষ ও রমণীর অধিকার বাড়িয়া চলিল। পূর্ব্বে, পুত্রে উপার্জ্জন করিলেও, যাহা পিতার সম্পত্তি হইত, তাহা ক্রমশঃ পুত্রের পৃথক সম্পত্তি গণ্য হইল। পুত্র শ্রম করিয়া যাহা লাভ করিত, তাহা ক্রমে আর সমগ্র পরিবারের ভোগ্য রহিল না। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের, পুরুষ স্ত্রীর, পিতা-পুত্রের সর্ব্ববিধ অধিকারের বৈষম্য দূর করিবার নিয়ত চেষ্টা, সভ্যতার শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত সমান চলিয়াছে। অধিকাংশ লোকই, পৃথক সম্পত্তি (private property) সমাজে বজায় রাখিয়া সাম্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। একদল বলেন যে, সকল বৈষম্যের মূলে, পৃথক্ সম্পত্তি। মূলে কুঠারাঘাত কর, তবে সাম্য সম্ভব হইবে। বহু পল্লীসমাজ, এক ভাষায়, সদৃশভাবে, সদৃশ আচারে জমাট বাঁধিয়া এক রাষ্ট্র হইল। রাষ্ট্রপতির শত্রু, রাষ্ট্রের ভিতরে ও বাহিরে। এক রাষ্ট্রপতি অপর রাষ্ট্রপতির সহিত সংগ্রামে মাতিয়াছে। চেষ্টা পররাষ্ট্রের সম্পত্তি লাভ করিবার। পররাষ্ট্রের রমণীর প্রতি লোভ। পররাষ্ট্রের পুরুষদিগকে পরাজিত করিয়া দাস রাখিবার চেষ্টা। দুই রাষ্ট্রপতিতে ঘোর সংগ্রাম চলিল। বর্ব্বর মানুষের শিকার প্রবৃত্তির এই নূতন রূপ। আবার স্বীয় রাষ্ট্রের ভিতরেও রাষ্ট্রপতির শত্রু আছে। একজন অপর জনের সম্পত্তি নিতে চায়। রাষ্ট্রের ভিতরে মানুষের নিজ নিজ সম্পত্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতির কর্ত্তব্য। সুতরাং, রাষ্ট্রপতির সৈন্যের প্রয়োজন। তখন সৈন্যগণ, রাষ্ট্রপতির আদেশে, বাহিরের শত্রু ভিতরের শত্রু, উভয়ই দমন করিত। আজকালকার ভাষায় বলিতে গেলে, সৈন্যগণ পুরাকালে পুলিসেরও কাজ করিত।

সেনা নিয়োগের বহুপূর্ব্বে দলপতি দেখিয়াছেন যে যখন নায়ক-পিতৃগণ সকলে তাহাকে মানিয়া চলিয়াছে, যখন সকল দাস তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছে, তখনও তাঁহার ইচ্ছামত সকল ব্যাপার ঘটে নাই। মানুষ যাহাদিগকে মানুষ বলিয়া জানে তাহারা ছাড়া অপর এক বা অধিক পুরুষের ধারণা মানব মনে আসিয়াছে। সে পুরুষের শক্তি দলপতির শক্তিকে পরাস্ত করে। তাঁহার সৌন্দর্য্য, তাঁহার মঙ্গল স্বভাব, যে কোনও মানুষের চেয়ে বেশী। সেই শক্তিমান্ শিব সুন্দর দেবতাকে মানুষ স্বতঃই ভয়ে ও ভক্তিতে প্রণাম করিয়াছে। দেবতার ভয়ে বা আদর্শে মানুষ নিজের হিংসা, ক্রোধ, লোভ—এক কথায় সমগ্র মানব-মনকে—সংযত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান জাগিয়াছে,

সমগ্র মানবজীবন ধর্ম্মের বাঁধনে পড়িয়াছে। সেই সঙ্গে ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মসংরক্ষণ উদ্দেশ্যে, সমাজে একশ্রেণী লোক দেখা দিল, তাহারা প্রধানতঃ ধর্ম্ম লইয়াই থাকিত। তাহারা পুরোহিত ব্রাহ্মণ। ধর্ম্ম সে সময় সমগ্র জীবনের উপর আধিপত্য করিত। রাজ্যশাসন, পরিবার পরিচালন, বাণিজ্য, দেশজয়—সবই ধর্ম্মের অন্তর্গত। সুতরাং রাষ্ট্রপতি যতই শক্তিমান্ হউন, ব্রাহ্মণের সম্মান সর্ব্বত্রই। পুরোহিত ধর্ম্মরক্ষকের নিকট রাষ্ট্রপতিরও মাথা হেঁট হইত—যেমন ভারতবর্ষে, তেমনই ম্লেচ্ছ দেশে।

কৃষি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বিকাশ। শিল্পের উন্নতি হইতে লাগিল। বাণিজ্য তখন আর গ্রামে আবদ্ধ রহিল না, গ্রামের সহিত গ্রামের বাণিজ্য, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের বাণিজ্য। দক্ষিণ ভারতের আদিম দ্রাবিড় অধিবাসীগণ, সমুদ্র পার হইয়া পররাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিল। শ্রমসাধ্য শিল্পের বিস্তারের সঙ্গে শ্রমজীবির সংখ্যা বাড়িতে চলিল। মানব সমাজে সম্পত্তির বৈষম্যও বাড়িতে চলিল। ধনীর ধনবৃদ্ধি, দরিদ্রের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ফল, বৈষম্য। কিন্তু, মানুষের মনে, সাম্যের আদর্শ একবার যে জাগিয়াছে, তাহা সুখলিপ্সা বা স্বার্থপরতা আসিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, পারিবেও না। সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু সেই বর্ব্বর, হিংসুক, ক্রোধী, লোভী মানুষ, আজও বৈষম্যে সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া চূরমার করিতে ও সাম্যের মহান্ উদার আদর্শে তাহা পুন গঠিত করিতে কখনও কখনও নিজের সর্ব্বস্ব, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত, হাসিমুখে বিসর্জ্জন দিতেছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা ছাড়িয়া এখনকার ইতিহাসের কথা বলি। ভারতের অতীত ঐতিহাসিক গৌরবের কথা কে না জানে? জানি আর নাই জানি, নিজেরা এখন দরিদ্র বলিয়া, ধনী পূর্ব্বপুরুষের ধনদৌলতের গর্ব্ব, সময়ে অসময়ে, সুযোগ পাইলেই আমরা করিয়া থাকি। অতীতের গর্ব্ব করিবার জন্য নয়, অতীত বুঝিয়া বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ নিয়মিত করিবার জন্য, অতীতের দুই চারিটী কথা বলিব। যে ক্ষীণ জলস্রোত হরিদ্বার হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বত্র সাগরাভিমুখে ছুটিতেছে। পথে শত বন ভাসাইয়া নিয়া, শত পাহাড় পাশ কাটাইয়া, সে জলস্রোত আজও সাগরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। পথে আবার শত জলস্রোত আসিয়া মিশিয়া, তাহার সাগরাভিমুখী গতি বাড়াইয়াছে। কোথায়ও বা দুই এক যায়গায়, পথহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট জলধারা, সাগরের দিকে না গিয়া, ধরিত্রীতেই শুকাইয়া গিয়াছে বা বিলে মিশাইয়াছে। কিন্তু, তখনও দুই পার্শ্বের ভূমি, সেই পথহারা জলধারার সংস্পর্শে সুশীতল ও উর্ব্বর হইয়া, ধরিত্রীর কি অপূর্ব্ব শোভারই সৃষ্টি করিয়াছে। মানব ইতিহাসের ঘটনাস্রোত তেমনই, সাম্য ও ন্যায়ের অনন্ত আদর্শে মিশিবার জন্য, সুদূর অতীত হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। ভারতের ইতিহাসের ঘটনাস্রোতের গতি কোন্ দিকে, তাহা বুঝিবার জন্য, পথে কোন্ কোন্ স্রোত আসিয়া তাহার গতি দ্রুততর করিয়াছে, কোথায়ই বা পথহারা হইয়া স্রোত বিলে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য অতীতের দুই চারিটী কথা বলিব।

বর্ব্বর, শিকারী মানুষের মাসিডোনীয় বংশধর, ভুবনবিজয়ী সেকান্দর যখন স্বীয় শক্তির

মোহে উন্মত্ত ও বর্ব্বর যুগের নির্ম্মম হিংসা ও সভ্যযুগের যশোলিপ্সায় প্রণোদিত হইয়া, ভারতের উত্তর-পশ্চিম খণ্ড জয় করিয়া সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে আসিলেন, তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতবাসী সেনানায়ক ও সৈনিকগণ যুদ্ধে সুনিপুণ। শুধু সংহার ব্যাপারে নয়, সংরক্ষণ ও সংগঠনেও ভারতবাসী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। পঞ্চনদকূলে বেদগান করিয়া, আর্য্যসভ্যতা যখন গঙ্গারধারা অনুসরণ করিতে করিতে, ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন কি অলৌকিক রামায়ণ মহাভারত, কত উপনিষদ, কত ধর্ম্মসূত্র, কত নাট্যকাব্য রূপকথা, কত নীতিশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, কত ব্যাকরণ ও অভিধান, কত গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ণ ও আয়ুর্ব্বেদ রচনা করিয়া পৃথিবীর সম্পদ্ বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীর অর্দ্ধেক নরনারী বর্ব্বর-সুলভ হিংসা দমন করিতে অশক্ত হইয়া, ভক্তিভরে যাঁহার চরণোদ্দেশে প্রণাম করিয়া, বাসনার নিবৃত্তি ও মৈত্রী ধর্ম্মপালনের জন্ম মনে বল চাহিতেছে, তিনি সেই নিবৃত্তি-সাধক সর্ব্বত্যাগী অহিংসা-মূলমন্ত্র-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শাক্যসিংহ। ধর্ম্মের প্রভাবে, শিল্পসৌন্দর্য্য রচনায়, ভারত কি কৃতিত্বই না দেখাইয়াছে! পাথর দিয়া সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি ও ধর্ম্মের গৌরব-ঘোষণা দেখিতে চাও? ঐ দেখ—মার্ত্তণ্ড, মথুরা, ভার্হুৎ, সাঞ্চী, ভুবনেশ্বর, কনারক, অমরাবতী, এলোরা, অজণ্টা, মামল্লপুরম্, মাদুরা, তাঞ্জোর, রামেশ্বরম্ কি শিল্প-সম্পৎ দেখাইতেছে। রেখা ও রং দিয়া সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দেখিতে চাও? ঐ দেখ—অজন্টার গুহামন্দির আজও পৃথিবীকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। অর্ণবপোতে সাগর পার হইয়া, বাণিজ্য বা ধর্ম্মপ্রচার করিতে ভারতবাসী কত না দেশবিদেশে গিয়াছে। তাহার সভ্যতা আজ সিংহলে, তাহার মন্দির আজ বোরোবুদুরে। ভারতীয় সুনিপুণ শিল্পীর প্রস্তুত নিত্যব্যবহার্য্য কত সামগ্রী লইয়া দেশবিদেশে বাণিজ্য করিয়া ভারতবাসী এসিয়া ও ইউরোপে, ভারতের লুপ্ত-প্রায় যশ বিদেশীয় ভাষার অভিধানে চিরমুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। আজও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে পণ্ডিতগণ ধাতু-তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার সময়, দিল্লীর নিকটস্থ দেড় হাজার বৎসরের পুরাতন, প্রায় ষোলহাত উচ্চ লৌহস্তম্ভের ছবি ছাত্রদিগকে দেখাইয়া, ভারতীয় কর্ম্মকারের ধাতুতত্ত্বজ্ঞান ও কর্ম্মকৌশলের প্রশংসা করিতেছেন। ভারতবাসী রাষ্ট্রশাসননীতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মণমন্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী নমস্ত সম্রাট দেশ-সুশাসন করিয়া অমর হইয়াছেন, ভারতসম্রাট্ অশোক তাঁহাদের মধ্যে একজন। শুধু সম্রাট অমাত্যসাহায্যে সাম্রাজ্য শাসন সংরক্ষণ করিতেন এমন নয়, প্রজাগণও প্রজাতন্ত্র নিয়মে সময়ে সময়ে রাষ্ট্রশাসন করিয়াছেন। কিন্তু সে প্রজা কাহারা? সে প্রজাতন্ত্রে সমাজের নিম্নস্তরের জনগণের কতটুকু স্থান ছিল? এই যে বিশাল বিস্ময়কর আর্য্যসভ্যতার কথা বলিলাম, ইহা ত শুধু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের চেষ্টায় গড়িয়া উঠে নাই, ইহার জন্ম লক্ষ লক্ষ শূদ্র ও দাস, দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর, শ্রম করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহাদের স্থান ছিল কোথায়? আর্য্য ও দ্রাবিড়ের বহুশতাব্দীব্যাপী প্রাণপণ বিরোধের পর, বিজেতা আর্য্যগণ ক্রমে মানব-স্বভাব-সুলভ অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। সাম্যবাদী বৌদ্ধ

শ্রমণের প্রভাবে অবশেষে পরাজিত আদিম অধিবাসীদের বংশধরগণের সহিত মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইল। আর্য্য ও দ্রাবিড় অলক্ষিতে অনেকটা মিশিয়া গেল। ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে আবার মঙ্গোলও সেই সঙ্গে মিশিয়া গেল। বহুশতাব্দীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন হিন্দু, এই আর্য্য সভ্যতার উত্তরাধিকারী। কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করি, এই বিশাল বিস্ময়কর সভ্যতায় হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের অসংখ্য জনগণ কতটুকু স্থান পাইয়াছে? আজই বা তাহাদের অধিকার কতটুকু?

(৩)

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পৃথিবীতে প্রথম মুসলমানের অভ্যুদয়। সর্ব্ব প্রথমে, সপ্তম শতাব্দীতে, মুসলমানগণ ভারতের মাটিতে পা দেন। কিন্তু ভারতে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হয়, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। সুতরাং, ভারতে মুসলমান আধিপত্য বহুকালের নয়, মাত্র ছয়শত বৎসর কাল ছিল।

ভারতের অনেক মুসলমানই,—বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ মুসলমান,—কেবল-মাত্র আচারে ও ধর্ম্মে হিন্দুদিগের হইতে পৃথক্। মুসলমান হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ বংশে বা জাতিতে হিন্দু হইতে বিভিন্ন ছিলেন না। সুতরাং, অধিকাংশ ভারতবাসী মুসলমান কিয়ৎপরিমাণে আর্য্যসভ্যতার উত্তরাধিকারী।

যুদ্ধের পর যুদ্ধ, ধ্বংসের পর ধ্বংস, ধ্বংশাবশিষ্টেরও নাশ বা রূপান্তর। ছয়শত বৎসর এইরূপে কাটিয়াছে। মাঝে মাঝে যখন শান্তির প্রসন্ন আননে দেশবাসী আনন্দিত হইয়াছে তখন সে আনন্দে যোগ দিয়া, মুসলমান বাদশাহগণ ভারতের সম্পদ বাড়াইয়াছেন! পৃথিবীতে অতুলনীয় তাজমহল, মুসলমান-কীর্ত্তি। আগ্রার মতি মস্‌জিদ, দিল্লীর কুতব মিনার ও জুম্মা মস্‌জিদ, বিজাপুরের বোলি গুম্বজ, ফতেপুর শিকরি ও শেকান্দ্রা—পৃথিবীর যে কোন দেশের গৌরব বাড়াইত। মুসলমানদের সৃষ্টি, উর্দ্দু ভাষা ও সাহিত্য। মুসলমান লেখকগণ ভারতের তৎকালীন ইতিবৃত্ত লিখিয়া এক নূতন চিন্তা রাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। পৃথিবীর অমর নমস্ত সম্রাটদের মধ্যে আকবর একজন। দেশ ও দেশবাসীর সংরক্ষণ শাসন ও পোষণ জন্য মুসলমান বাদশাহ, তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যে এক নিয়মে এক পদ্ধতিতে বিধি-ব্যবস্থা করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রসমূহে এক রাষ্ট্রবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। সে শাসনপদ্ধতির কিছুটা আজও ভারতবর্ষে প্রচলিত। বাদশাহী আমলে শিল্পের কত উন্নতি, বাণিজ্যের কত বিস্তার হইয়াছিল! কিন্তু এমন প্রবল সাম্যবাদী মুসলমান ধর্ম্মই বা সে শাসন বিধিব্যবস্থাতে, সে বিস্তৃত বাণিজ্যের ফলভোগে, নিম্নস্তরের অসংখ্য জনগণকে কতটুকু অধিকার দিয়াছিল? উচ্চশ্রেণীর জনকয়েকের কথা বলিতেছি না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, নিম্নশ্রেণীর অসংখ্য জনসাধারণ কতটুকু অধিকার পাইয়াছিল?

ইসলাম প্রবল সাম্যবাদী বটে, কিন্তু তাহাতে স্ত্রীজাতির অধীনতা ও পৃথক সম্পত্তি (private property) উভয়ই মানিয়া নেওয়া আছে। স্ত্রীকে আদর ও যত্নের সহিত পালন করিবার আদেশ ইস্‌লাম-বিশ্বাসী স্বামী শিরোধার্য্য করে। কিন্তু, স্ত্রী অবরুদ্ধা বন্দিনী; শাসনের প্রয়োজন হইলে, স্বামী তাহাকে প্রহার করিবার অধিকারী। নর-নারীর সমান অধিকার

ইস্‌লাম মানেন না। পৃথক্ সম্পত্তি মানিলে, ধনমানের বৈষম্য স্বীকার করিতেই হইবে। ইস্‌লাম আদেশ দিলেন যে প্রভু যাহা আহার করিবে, প্রভু যাহা পরিধান করিবে, সেই আহার্য্য, সেই পরিধেয় প্রভু দাসকে দিতে বাধ্য। দাসের দোষ অমার্জ্জনীয় হইলে, দাসের উৎপীড়ন বা নির্য্যাতন প্রভুর পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু প্রভুর পক্ষে দাস বিক্রয়ের অনুমতি রহিল। সেই জন্য দাস দাসই রহিল। ইস্‌লাম বিশ্বাসীর মধ্যে একজনের প্রাণহানি বা সম্পত্তিহরণ অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু ইস্‌লাম-বিশ্বাসী যেখানে বিজেতা, ও অবিশ্বাসী যেখানে পরাজিত, সেখানে পরাজিতের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার নূতন কোনও ব্যবস্থা, মানবসমাজ ইসলামের নিকট পাইল না। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে এমন প্রবল সাম্যবাদী ইসলামের প্রভাবেও, ভারতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইল না। নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ ভারতে ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, রাজধর্ম্মের সুবিধা কিছুটা ভোগ করিয়াছিল বটে। কিন্তু সে অধিকার কতটুকু? সে অধিকার নিম্নশ্রেণীর কয়জন পাইয়াছিল?

হাজার বৎসরের অধিক কাল ভারতের স্থানে স্থানে যীশু প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। সে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র কি? জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর সব মানুষ, ভাই। পাপী বা পুণ্যবান, সব মানুষ এক প্রেমময় পিতার সন্তান। ধরায় স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ প্রায়। সে স্বর্গরাজ্য, মানবহৃদয়ে। স্বর্গরাজ্যের প্রথম সোপান, অনুতাপ। চিত্তশুদ্ধি, চিন্তায় বাক্যে ও কর্ম্মে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত না হইলে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ অসম্ভব। পরিবার, দল, সমাজ —সকল পুরাতন গণ্ডী ভাঙ্গিয়া, বিশ্বমানবের নবজন্ম হইবে, তবে স্বর্গরাজ্য অবতীর্ণ হইবে। যীশুর স্বর্গরাজ্যে পৃথক্ সম্পত্তি (private property) নাই, দাসত্ব নাই। তাহা মৈত্রী ও সাম্যের রাজ্য।

খ্রীষ্টিয়ান-ধর্ম্ম ঠিক যীশু প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম নয়। পৌলের সহিত যীশুর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। পৌল যীশুপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা খ্রীষ্টীয়ান-ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। পৌল পৃথক্ সম্পত্তি মানবসমাজ হইতে দূর করিয়া দিতে চান নাই। দাসদিগকে পৌল উপদেশ দিলেন—দাসগণ, তোমাদের প্রভুদিগকে মানিয়া চলিবে। পৌল-প্রচারিত খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মে বৈষম্য স্থান পাইল। ইউরোপে যীশু-প্রবর্ত্তিত-ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পৌল-প্রচারিত খ্রীষ্টীয়ান-ধর্ম্ম অধিক আদর পাইয়াছে। কিন্তু পৌল-প্রচারিত ধর্ম্মও ষোল আনা গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সবল সতেজ বর্ব্বর-প্রায় ইউরোপীয় জীবের ছিল না। সুতরাং, তাহারা পৌল-প্রচারিত ধর্ম্ম ও সবল সতেজ জীব-ধর্ম্ম, এই দুইয়ের একটা সামঞ্জস্য করিয়া খ্রীষ্টীয়ান-ধর্ম্ম গড়িয়া তুলিয়া, তাহাই ভারতে খ্রীষ্টীয়ান-ধর্ম্ম নাম দিয়া প্রচার করিয়াছে। ইউরোপীয় জাতিসমূহ যীশু-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ত মানেই নাই, পৌলপ্রচারিত ধর্ম্মও মানে নাই। ইউরোপীয় খ্রীষ্টিয়ান বণিকগণ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, লোভ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া, খ্রীষ্টিয়ানে খ্রীষ্টিয়ানে, খ্রীষ্টিয়ানে হিন্দুতে, খ্রীষ্টিয়ানে মুসলমানে, ও হিন্দু-মুসলমানে ষড়যন্ত্র, মারামারি, কাটাকাটি চালাইয়াছে। ৪০০ বৎসর বাণিজ্য চলিয়াছে। তাহার পর, ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টিয়ান বণিকের রাজত্ব সুরু হয়। ১৮৫৭ সাল হইতে খ্রীষ্টিয়ান সম্রাটের ভারতে একাধিপত্য।

ভারতে যখন মুসলমান প্রভাব, তখন ভারতের বাহিরে তিনটী অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। তাহাতে পৃথিবীর ইতিহাস বদলাইয়া যায়। প্রথম ব্যাপার, যুদ্ধে বারুদের ব্যবহার। ভারত-বর্ষে এই বিনাশকারী দ্রব্যের বহুল প্রচলন হয়, খ্রীষ্টীয় প্রভাবকালে। পূর্ব্বে যুদ্ধে হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিক সৈন্যের সাহস ও বল, ইহাই সেনানায়কের আশা ভরসা ছিল। বারুদের প্রচলনের পর হইতে, সেনাশক্তির পরিমাণ গণনাতে বিপ্লব উপস্থিত হইল। বারুদ শয়তানের আবিষ্কার বলিয়া অভিহিত হইল। ইউরোপীয় বীরগণ বলিতে লাগিলেন, বারুদ আসাতে শৌর্য্যবীর্য্য পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইল। ইউরোপীয় সমর কুশল নেতাগণ, দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধে বারুদ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যুদ্ধজয় সহজ হইল। দ্বিতীয় ব্যাপার, মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন। ভারতের এই আবিষ্কারের সম্যকপ্রচলন হয় খ্রীষ্টিয়, শাসনকালে। বৈষম্য দূর করিবার পথ ইহাতে যেমন প্রশস্ত হইয়াছে, এমন আর কিছুতে হয় নাই। ইহার সাহায্যে মানবসমাজে বৈষম্য-বোধ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয় অদ্ভুত ব্যাপার বাষ্পীয় চালকযন্ত্রের প্রচলন। পূর্ব্বে ৫০০ লোক যে কাজ করিত, এখন বাষ্পীয় চালকযন্ত্রের সাহায্যে মাত্র ১০ জনে তাহার অধিক কাজ করিতেছে। ইহার সাহায্যে, লৌহপথের বা সমুদ্রের উপর দিয়া, একমাসের পথ একদিনে যাওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই তিন আবিষ্কারের অপব্যবহার হয় নাই কে বলিবে? কিন্তু যতই গালি দেও, ইহাদের ব্যবহার বর্জ্জন করিতে চাহিলেও কয়েকশত বৎসরকাল মানুষ তাহা পারিবে না। ইহাদের নূতন নূতন উন্নতি হইতেছে ও হইবে। যাঁহারা ইহাদের অপব্যবহারের নিন্দা করেন, তাঁহারাই আবার ইহাদের প্রচলনের সহায়তা করিতেছেন।

(৫)

আজ ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শান্তি। মধ্যএশিয়া বা ইউরোপ হইতে কোনও রাষ্ট্রপতি আজ ভারতে আসিয়া সেনানা-সাহায্যে ভারতরমণীকে বা ভারত-বাসীর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক হরণ করিতে সাহস পায় না! রাষ্ট্রমধ্যে আজ তুমি, অলঙ্কার-ভূষিতা তোমার যুবতী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেছ। এই শান্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবের কথা।

যদি কোনও রাষ্ট্রপতি না থাকিত, রাষ্ট্রীয় শাসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা কিছুই না থাকিত, স্বদেশী বিদেশী সকল মানুষ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মের আদেশ মানিয়া চলিত, নিরীশ্বরবাদী ধর্ম্ম না মানুক, যদি শুধু নীতি মানিয়া চলিত, তাহা হইলে এই শান্তি-সংস্থাপনের জন্য রাষ্ট্রীয়-শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন হইত না। রাষ্ট্রেরই (state) প্রয়োজন হইত না। কিন্তু, ধর্ম্ম বা নীতি, আজও শিকারী মানুষকে সম্পূর্ণ বশ করিতে পারে নাই। প্রজা শিকারীর স্বভাব দূর করিতে পারে নাই, রাজাও পারে নাই, এমন কি পুরোহিতও পারে নাই। কিন্তু, শিকার-প্রবৃত্তি মানুষের ভিতরে যেমন আছে, সংযম-প্রবৃত্তিও তেমনই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। যেমন বিনাশের ইচ্ছা স্বাভাবিক, তেমনই সংগঠন ও সংরক্ষণের ইচ্ছা মানুষের স্বভাবগত। এক রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া গেলে, অপর রাষ্ট্র আপনা আপনিই গড়িয়া উঠিতেছে। এমন কি, রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা না থাকিলেও যে পৃথিবী হইতে শান্তি অন্তর্হিত হইত, তাহা মনে হয় না।

মানুষ সময়ে সময়ে একে অন্যকে সংহার করিতে চাহে, ইহা যেমন সত্য, আবার মানুষ মানুষকে ভালবাসে, তাহাও তেমনি সত্য।

ইতিহাস রচনার পূর্ব্ব হইতে পৃথক্ সম্পত্তির (private property) আবির্ভাব। আজও সর্ব্বত্র পৃথক্ সম্পত্তি। আজ মানুষ বনে জঙ্গলে বাস করে না। সম্পত্তি লাভ না করিলে, ক্ষুধা দূর করিতে পারে না। ক্ষুধা আজও মানুষের সঙ্গী। আজ ধন-বৈষম্যের ফলে তুমি সুখে বিজলি বাতি ও পাখার বাতাস ও মোটর গাড়ী উপভোগ করিতেছ, সুস্বাদু খাদ্য ও রুচিকর পানীয় দ্বারা আনন্দ লাভ করিতেছ। আর ঐ দেখ, লক্ষ লক্ষ স্বদেশবাসী একমুষ্টি অন্নের অভাবে, সেই চির-সহচর ক্ষুধার তাড়নায় মানব-স্বভাব হারাইয়া, পশুরও অধম হইতে চলিয়াছে। একবার হিসাব করিয়া দেখিও, অভাব-নিষ্পেষিত লোকের সংখ্যা ভারতবর্ষে শতকরা কতটা।

শান্তি স্থাপন যদি রাষ্ট্রের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হয়, তাহার পরেই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য যে, দেশবাসী শ্রম করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা-বিধান। পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্র আজ পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা ভাল করিয়া করিতে পারে নাই। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য এ বিষয়ে আদৌ কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হয় নাই।

তারপর প্রশ্ন উঠে, দেশ বাসের যোগ্য কি না। ক্ষুধার যদিই বা নিবৃত্তি হয়, দেশবাসী দেশে সুস্থ থাকে কি না। স্বাস্থ্যোপযোগী পানীয় জল দেশে পাওয়া যায় কি ? ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া লোক অস্থিচর্ম্মসার হইতেছে কি ? যদি হয় তবে রোগ-নিবারণ, ও রোগ হইলে, তাহার উপশমের ব্যবস্থা বিধান, রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। দেশকে স্বাস্থ্যোপযোগী ও বাসযোগ্য রাখা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য কতটুকু কৃতিত্ব দেখাইয়াছে ? কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে প্রদীপমালার ক্ষীণালোকে রাজপথ ঈষৎ আলোকিত করিলেই, সে রাষ্ট্র সভ্যরাষ্ট্র হয় না।

আধুনিক রাষ্ট্রের আর এক প্রধান কর্ত্তব্য, লোকশিক্ষা বিস্তার। অল্পবয়স্ক যত বালক ও যত বালিকা, প্রত্যেককে কিছুটা শিক্ষাদান করা রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে ধর্ম্ম-মণ্ডলী এই কাজ করিত। আজও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধভিক্ষুগণ এই কাজ করেন। এখন কিন্তু এ দায়িত্ব প্রধানতঃ রাষ্ট্রের। শিশুগণ যথাসময়ে শিক্ষালাভ করিলে, তাহারা যখন যুবক বা যুবতী হইবে, তখন তাহারা শান্তিরক্ষা করিবে, নিজের ও সন্তানসন্ততির ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিবে ও স্বাস্থ্য-রক্ষা করিবে। রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হইয়া রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যসাধনে সহায়তা করিবে।

রাষ্ট্রের আর এক কর্ত্তব্য, সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার সহায়তা করা। দেশবাসীর ভিতরে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানে উৎসাহ জাগাইতে হইবে। ভারতবাসী স্বীয় সাহিত্যের ও শিল্পের চর্চ্চা করিয়া জগতের সাহিত্য ও শিল্প-সম্পৎ বৃদ্ধি করিবে। এ বিষয়ে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কৃতিত্ব কত কম! পূর্ব্বে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্প-সম্পদের কিছু আভাস দিয়াছি। তাহার তুলনায় ভারতবাসীর শিল্প-চর্চ্চা আজ কতটুকু ? দেশের লক্ষলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির নির্ম্মিত হইল। ভারতবাসীর তাহাতে গৌরব করিবার কিছু আছে কি ? হিন্দু মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান কেহ কি ঐ স্মৃতি-মন্দিরটীকে ভারতবাসীর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রয়াস বলিয়া মনে করিতে পারেন ?

এরূপ হয় কেন? ক্ষুধায় উৎপীড়িত, ম্যালেরিয়ায় কঙ্কালসার, পানীয় জলের অভাবে রোগগ্রস্ত, শতকরা ৯০ জনের অধিক নিরক্ষর, সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চ্চায় দেশবাসী নিরুৎসাহ! এরূপ কেন হয়? নিজের রাষ্ট্র যাহারা নিজেরা চালায় না, তাহাদের দুর্দ্দশা এইরূপই হয়। ইহার প্রতিকার কি? প্রতিকার—স্বরাজ।

শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

প্রভাতী।

(১)

ভারতের শান্ত তপোবনে
তরুণ তাপস দল।
জাগ জাগ আজ,
লক্ষ্যহারা নিখিল ভুবনে
তোমাদের পুণ্যোজ্জ্বল
আছে আছে কাজ।
বালাকের স্বর্ণরশ্মি তোমাদের করে অভিষেক
পাখী গাহে উদ্বোধনী-গান;
প্রতীক্ষা-ব্যাকুল চিত্তে সারা বিশ্ব আছে অনিমেষ
দেবশিশু, হও আগুয়ান।
ভবিষ্যৎ-জগতের দীক্ষা-গুরু সত্যই তোমরা,
ন্যায় ধর্ম্ম-সত্য-প্রেমে সাজাইবে প্রাণের পশরা,
সাম্য-মৈত্র-স্বাধীনতা তোমাদের জপ-মন্ত্র হবে,
নিশ্চিন্ত নির্ভীক চিত্তে দাঁড়াইবে তোমরা গৌরবে
উচ্চে তুলি শির,
শত ঝঞ্ঝা অবহেলি' তুঙ্গ শৃঙ্গ যথা হিমাদ্রির।

(২)

হিংসা-দ্বেষে পূর্ণ চারিধার
স্বার্থে স্বার্থে অবিরাম
আত্মঘাতী রণ,
শুধু তমঃ শুধু হাহাকার
মানবের পীঠধাম
করিছে মন্থন।

রবষিয়া শান্তিধারা, হে নিষ্কাম কর্ম্মযোগীগণ!
　　অগ্রসর হও আজি সবে,
আশা-আশ্বাসের বাণী প্রীতিভরে কর উচ্চারণ
　　ধ্রুব জ্যোতিঃ জ্বালিয়া নীরবে!
নবীন ঋত্বিকবৃন্দ! করি হর্ষে আত্মাহুতি দান
তোমরা করিবে আজ অভিনব যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
তোমরা এ মহাযোগে নব ঋক করিবে রচনা,
উদার প্রাণদ পূত মূর্ত্তিমতী উদগ্র সাধনা
　　　　বীজ-মন্ত্র যার;
বিনাশি' বিশ্বের গ্লানি মন্দাকিনী বহিবে আবার!

(৩)

আত্ম-হারা উদ্‌ভ্রান্ত জগৎ
　দুস্তর মৃত্যুর পথে
　　　　ছুটিয়াছে আজ,
করি সার অসত্য অসৎ
　জীবনের শুভব্রতে
　　　　লুটে ধূলি মাঝ!
অমৃতের পুত্রগণ! হাত ধরি উঠায়ে তাহারে
　　বাঁধ আজি গাঢ় আলিঙ্গনে;
তৃষিত তাপিত আত্মা সিক্ত হোক্ অমৃত-পাথারে
　　পূত হোক গায়ত্রী-মিলনে!
সম্মুখে উজ্জ্বল আলো পাছে ফিরে চাহিও না আর,
দৃপ্ত তেজে ধেয়ে এস, সুনিশ্চিত বিজয় এবার!
বালব্রহ্মচারীদল! তোমরাই সত্য শক্তিধর
যুগ-প্রবর্ত্তন-নেমি চালাইতে সবল সুন্দর
　　　মঙ্গল-অঙ্গনে;
যুগ-স্রষ্টা ঋষি জাগে তোমাদেরি দিব্য আবাহনে!

(৪)

জগতের মাঝখানে আজি
　ভারতের সিংহাসন
　　　　প্রতিষ্ঠিতে হবে,
পাঞ্চজন্য উঠিয়াছে বাজি'

যুগাচার্য্য নারায়ণ
ডাকিছেন সবে।
সকল দৌর্ব্বল্য-কুণ্ঠা পরিহরি' চিরদিন তরে
জাগ, জাগ, ঋষি সুতগণ।
বৈরাগ্যের অন্তরালে কি ঐশ্বর্য্য অনুক্ষণ ক্ষরে
দাও আজি তা'রি নিদর্শন।
অনন্তের পান্থ যারা দু'দণ্ডের ক্ষুদ্র খেলা-ঘরে
কেমনে বাধিবে বল, আপনারে তারা আজি ধরে,
অসীম আকাশ ঊর্দ্ধে, নিম্নে ধরা দিগন্ত বিস্তার
অফুরন্ত ধারে নিত্য ঝরিতেছে কৃপা বিধাতার
কে রবে বঞ্চিত.
তরুণ সাধকবৃন্দ! এস, এস, সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সমাজ সংস্কার।

[বরিশালে বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-সামাজিক-সম্মিলনে (১৩ চৈত্র, ১৩২৭ সন) সভাপতির অভিভাষণের সারমর্ম]

শাস্ত্র বড় না দেশাচার বড়?

সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি কি পরিমাণে শাস্ত্রের অনুশাসনের উপর দাঁড় করান যাইতে পারে, গত অধিবেশনের সভাপতি, পণ্ডিত মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহা দেখাইয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রের অস্ত্রাগার হইতে বাছা বাছা অস্ত্র বাহির করিয়া, দেশাচার-দুর্গ আক্রমণে প্রথম অগ্রসর হইয়াছিলেন, জাতিগত-সংস্কার-বর্জ্জিত জগন্মিত্র রাজা রামমোহন রায়। তাহার পর, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর। আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞান-বলে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, উপনিষদে বা বেদান্তে কীর্ত্তিত সেই ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার কল্পে, ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় আত্মীয় সভা স্থাপন করেন। কিন্তু "দেশাচারই সার ধর্ম্ম" এই বুদ্ধি-নাশ করিতে পারেন নাই। "উপনিষদে মোক্ষলাভ রূপ পরম মঙ্গল নিহিত আছে" শঙ্করাচার্য্যের এই আশ্বাসবাণী কয়জনের আত্মতত্ত্ব লাভের সহায় হইয়াছে? এই সময়ে রাজা সতীদাহ নিবারণের আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং প্রায় দশবৎসর আন্দোলনের ফলে উহা নিবারিত হয়। আজ কাল স্কুলের ছেলেরাও যে প্রথাকে বর্ব্বরোচিত বলিয়া মনে করে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, দেশাচার-রক্ষকগণ তাহার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় আন্দোলন উপস্থিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কথিত আছে যে, বিদ্যাসাগর-জননী এক বালিকার বৈধব্যে বিচলিত হইয়া, শাস্ত্রবিশারদ পুত্রকে বলিয়াছিলেন,—"তোদের শাস্ত্রে কি বিধবা বিবাহের বিধি নাই।"

পুত্র এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না৲ বটে, কিন্তু সেই দিন হইতে, শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া, বিধবা বিবাহের অনুকূল ব্যবস্থা আছে কি না জানিবার জন্য কঠোর পরিশ্রমে এবং কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, শাস্ত্রীয়-প্রমাণ দেখাইতে পারিলে, দেশবাসী সব মানিয়া লইবে। গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমেডিস (Archimedis) যেমন জলের ওজনে স্বর্ণের ভারিত্ব পরীক্ষার উপায় আবিষ্কার করিয়া, "পাইয়াছি, পাইয়াছি" রবে চিৎকার করিতে করিতে, উলঙ্গাবস্থায়, প্রকাশ্য রাজপথে ছুটিয়াছিলেন, সমাজ-সংস্কারক এই মহাপুরুষও স্মৃতি-শাস্ত্র হইতে বিধবা-বিবাহ-সমর্থক বচন-সংগ্রহ করিয়া, আনন্দে অধীর হইয়া, লোক-সমাজে প্রচার করিয়া কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। নিরপেক্ষ বিচারে, এই ব্যবস্থা অগ্রহনীয় হইলেও, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই বিদ্যাসাগরের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতিবাদীগণের মত খণ্ডন করিয়া, স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেও, হিন্দুসমাজের লোকের ধর্ম্ম-বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"ধন্যরে দেশাচার"! অতীতের স্তূপ খুঁড়িয়া রত্ন বাহির করিবার সাধ্য না থাকিলেও, অগ্রগামী মনীষীগণের চিন্তাস্রোতে যে সমস্ত স্বর্ণ-কণা সকল ভাসিয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমানের কূলে দাঁড়াইয়া, ভবিষ্যতের আশায় উহা সংগ্রহ করা, সামাজিক জীবের পক্ষে স্বাভাবিক। তাই অতীতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারিতেছি না।

মানবের বয়স কত ?

হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনত্ব লইয়া আমরা অনেক সময় গর্ব্ব করিয়া থাকি। Count Biornstjern (কাউন্ট-বিয়র্ণষ্টিয়ার্ণ) প্রভৃতির দোহাই দিয়া বলি যে, জগতের অন্য কোন জাতি সভ্যতার প্রাচীনত্ব লইয়া হিন্দুদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে আর্য্য-নিবাস সংস্থাপিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের মতে, আদিতে পৃথিবী ছিল না, রাত্রি দিনের প্রভেদ ছিল না, অতিদূর বিস্তৃত আকাশও ছিল না, কেবল একমাত্র বস্তু, বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে, আত্মামাত্র অবলম্বনে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। মনুসংহিতা পাঠে জানা যায় যে, যিনি মনোমাত্রগ্রাহ্য সূক্ষ্মতম অব্যক্ত সনাতন, সেই সর্ব্বভূতময় অচিন্ত্য পুরুষ স্বয়ংই শরীরাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সৃষ্টি-কার্য্য অনবরত চলিতেছে। উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। আর্য্য দর্শনশাস্ত্র সমূহে সৃষ্টি-কার্য্য অনবরত চলিতেছে। উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। আর্য্য দর্শনশাস্ত্র সমূহে সৃষ্টিতত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাঙ্খ্য মতে, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষ কর্ত্তৃক প্রকৃতির যে ভোগ এবং পুরুষের যে মুক্তি, এই উভয়ের জন্য, পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ বশতঃ, সৃষ্টি হইয়া থাকে। সাঙ্খ্য মতে ব্রহ্ম স্বীকৃত না হইলেও এবং অন্যান্য দর্শনে সামান্য মতদ্বৈধ দেখা গেলেও, এক পরম ব্রহ্ম হইতেই যে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাতে আর বিশেষ মতভেদ নাই। উপনিষদের মতে, প্রথমে এক ব্রহ্মই ছিলেন। তাঁহার বহু হইবার ইচ্ছা হইল, "একোহহং বহু স্যাং"। এই ইচ্ছাতে জগতের সৃষ্টি হইল। প্রথমে পৃথিবী, তাহার পর চরাচর

সৃষ্টি হইল। জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যাবিলনে যে মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সহিত ইহুদী ধর্ম্মমতের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। এই মতানুসারে, ভগবানের আদেশেই ক্রমে ক্রমে জগতের বিভিন্ন অংশের উৎপত্তি এবং সেই সকল অংশের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলেন—"আলোক হউক", অমনি আলোকের উৎপত্তি হইল। অর্থাৎ ভগবানের ইচ্ছায় "নাস্তি" হইতে "অস্তি" হইয়াছে। গ্রীসের প্রাচীন যুগের দার্শনিকগণের মতে, জগতের রূপ ও স্থিতি-কাল উভয়ই অনাদি ও অনন্ত। আমরা যে অবস্থায় জগৎ দেখিতেছি, সেই অবস্থায় ইহা আছে ও থাকিবে। এরিসটোটলের (Aristotle) মতে যাহার কারণ অনাদি ও অনন্ত, তাহা নিজেও অনাদি অনন্ত। এ পর্য্যন্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন মতানুসারে নিষ্ক্রিয় পরমাণু ক্রিয়াশীল হওয়ায় সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। আধুনিক গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ, অনন্ত ও অসীম শক্তির বিকাশ মাত্র—"all things proceed from infinite and eternal energy"। এই মতানুসারে আদিতে সূর্য্য এবং গ্রহ সকল ঘূর্ণায়মান জলন্ত-বাষ্পীয় অবস্থায় (nebular state) ছিল। পরে পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া অন্তরীক্ষে ঘুরিতে লাগিল। এই প্রকারে নবগ্রহের বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর যে জ্যোতির্ম্ময় গোলক অবশিষ্ট রহিল, ইহাই "সৌর-জগৎ-প্রসবিতা সূর্য্য"। সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর হইতেই, পৃথিবী ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হওয়ায় তাহার বহিরাবরণ (crust) গঠন হইতে লাগিল। পদার্থ-তত্ত্ব, ভূ-তত্ত্ব এবং প্রাণী-তত্ত্ববিদগণ, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখনও শেষ মীমাংসা হয় নাই। তবে ন্যূনকল্পে পৃথিবীর বয়স সাড়ে সাত কোটি বৎসর ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তৃত ভাবে গবেষণা করিবার স্থান এ নহে।

তথাপি কিছু না বলিলে আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলিতে পারিব না বলিয়া সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিতে হইতেছে। প্রাণীগণের আবির্ভাবের প্রথম হইতে ভূতত্ত্ববিদগণ পৃথিবীকে চারিস্তরে বিভক্ত করিয়াছেন যথা:—(1) Primary Period, (2) Secondary Period, (3) Tartiary Period and (4) Recent Period। অর্থাৎ প্রথম যুগে মেরুদণ্ডহীন জীব এবং মৎস্যের আবির্ভাব, পরে সরীসৃপের এবং তৃতীয় যুগে স্তন্যপায়ী-জীবজন্তুর আবির্ভাব। মানব-জন্মের যুগ, সর্ব্বশেষে। ক্রমবিকাশের ফলে, আদ্য জীবাণু (portist ancestors) হইতে মানুষ আদিম অবস্থায় পৌঁছিতে, ২।৩ লক্ষ বৎসর লাগিয়া থাকিবে। অন্ততঃ ২০,০০০ বৎসর হইতে পূর্ণাবয়বের মানুষ যে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যাবতীয় জীব ও জড় পদার্থ আদিম অবস্থা হইতে ক্রমশঃ উন্নততর অবস্থায় বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, এই দার্শনিক মত মানিলে বলিতে পারা যায় যে, ইতর জীব হইতে উদ্ভূত মানুষ, দেহ ও মনে, উহাদেরই উত্তরাধিকারী।

রসেটা প্রস্তর (Rosetta-stone) ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। উহার সাহায্যে মিশরের প্রাচীন ঐতিহ্য লোকসমাজে প্রচারিত হইবার পর, অনেকে মনে করেন যে সভ্যতার প্রথম জ্যোতিঃ, ১০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে, মিশরেই দেখা গিয়াছিল। নিউইয়র্ক (New York)

নগরের রক্ষিত হফ্‌ম্যান ট্যাবলেট Hoffman Tablet) ৭,০০০ বৎসর পূর্ব্বের অক্ষরে লেখা। ইহা হইতে অনেকেই মনে করেন যে আর্য্য সভ্যতা ৭,০০০ বৎসর অপেক্ষা পুরাতন নহে।

নূতন ভাবে সমাজ গঠন।

মনুসংহিতার মতে পরমেশ্বর আপনার মুখ, বাহু, উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রজারক্ষণ, দান, অধ্যয়ন, ভোগশক্তির পরিবর্জ্জন, এই কয়েকটি কর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের জন্য নিরূপিত আছে। পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্যবৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ এবং কৃষিকর্ম্ম বৈশ্যের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উপরোক্ত তিন বর্ণের সেবা করাই শূদ্রের প্রধান কর্ত্তব্য। আবার গীতার মতে গুণকর্ম্মের বিভাগে চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষা হইতেছে কিনা সন্দেহের বিষয়। জন্মগত অধিকার রক্ষা উচ্চশ্রেণীর লক্ষ্য হইলেও, অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা, গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে সমাজে নিজ নিজ স্থান অধিকারের জন্য অধৈর্য্য হইয়া ছুটিয়াছে। পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির ফলে মানব সমাজ তোলপাড় হইয়াছে। যাহা কিছু বাকী ছিল, গত যুদ্ধের ফলে তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। বহুদিন পূর্ব্বে অমর কবি হেমচন্দ্র তাঁহার দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে,
গগণের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে
বায়ু, উল্‌কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও;
তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হ'তে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।"

এই বাণী বঙ্গীয় যুবকদলের কর্ণে পৌছিয়াছিল বলিয়া বঙ্গমাতা জগদীশ, প্রফুল্লচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, ব্যোমকেশ প্রভৃতিকে ক্রোড়ে স্থান দিয়া গৌরবান্বিতা হইয়াছেন।

আর্থিক অবস্থা মন্দা হওয়ায়, পেটের দায়ে জন্মগত ব্যবসায়ের ধার কেহ ধারিতেছেন না। জাতের গোঁড়ামী নাই বলিলেই চলে। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম রক্ষাপ্রয়াসী ব্যক্তিগণও জাতীয় বৃত্তি রক্ষা অলঙ্ঘ্য কর্ত্তব্যস্বরূপ মনে করিতেছেন না। কর্ম্ম সমুদায়ের দোষগুণ বিবেচনা রহিত হওয়ায় চারি বর্ণই আচার ভ্রষ্ট হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ-সন্তান গায়ত্রী-জপাদির অনুষ্ঠান না করিয়াও দ্বিজ-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতেছেন না। "ব্রহ্মাবর্ত্ত" "ব্রহ্মর্ষি" বা "মধ্য দেশের" আচার "সদাচার" বলিয়া বাঙ্গালীরা মানিতেছেন না। একমাত্র সেবা ধর্ম্মই যেন সকল বর্ণের ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধর্ম্মে কর্ম্মে পরমত-সহিষ্ণুতা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। "ঠগ্ বাছিতে গাঁ উজাড়" হওয়ার ভয়ে অখাদ্য ভোজন ওজুহাতে দলাদলি বা "একঘরে" করার চেষ্টা সহরে ত নাইই, পল্লীতেও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে! মনু বলিয়াছেন পরমাত্মা হইতে সর্ব্বাগ্রে জল প্রসূত। কিন্তু বিজ্ঞানাগারে সর্ব্বজাতির ছাত্রেরা দেখিতেছে যে, দুইটী বাষ্পের (Oxygen and Hydrogen) মিশ্রণে জল উৎপাদিত হয় এবং সেই জল কোন

নীচ জাতীয় ছাত্রের হাতে অশুদ্ধ অবস্থায় পরিণত হয় না। পরন্তু নানা জাতীয় লোকের হস্তস্পর্শে কলুষিত ও জলশোধক যন্ত্র দ্বারা পরিষ্কৃত জলপানের ফল দেখিয়া ত্রিসন্ধ্যাকারী ব্রাহ্মণও গঙ্গাজল ত্যাগ করিয়া, কলের জলপানে স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রকার পরোক্ষভাবে "জলচল" আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা জাতীয় উন্নতির প্রবেশদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিও সেই দিকে ধাবিত হইতেছে। এ সময়ে পূর্ব্বসংস্কারে এবং কুসংস্কারের শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া নূতন ভাবে জাতিগঠনের দরকার পড়িয়াছে। সমাজ নূতন করিয়া গড়িবার জন্য সকল দেশের লোক ব্যগ্র হইয়াছে, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বিরোধ ঘুচাইয়া বিশ্বমানব এক হইতে চাহিতেছে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু যে প্রকার পূর্ব্বাভাস দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, আমাদের দেশের সকল শ্রেণীর লোকেরা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এখন

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য শূদ্র মিলে
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে
তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা।"

যে মহাপুরুষ ভারতে ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রাণপাত করিতেছেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন untouchability must go (অর্থাৎ, সংস্পর্শ দোষ দূর করিতেই হইবে), অতএব, এ সম্বন্ধে যুক্তি প্রমাণ প্রয়োগের আর দরকার মনে করি না।

সংহতি কার্য্য-সাধিকা।

আর্য্য অনার্য্যের সংঘর্ষের ফলে ভারতে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। যতদিন আর্য্যদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল, ততদিন সুশীতল বর্ণাশ্রমের ছায়ায় জ্ঞান প্রাধান্যের দ্বারা বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কেন না "সর্ব্বপ্রাণীহিতেরতঃ" ব্রাহ্মণগণ সমাজ-শরীরব্যাধি মুক্ত রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং তাহাতে সফলকামও হইতেন। অনার্য্য-দিগকে ক্রমে ক্রমে আর্য্যসভ্যতার অঙ্গীভূত করিতেও চেষ্টার ক্রটি হয় নাই। যাঁহারা "Totemism" (জন্তু বা বৃক্ষাদিতে বংশ-চিহ্ন-জ্ঞান) বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে, কারণ-জলে শক্তিবীজ সঞ্চারে অণ্ডে পরিণতি এবং সেই অণ্ডে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি প্রভৃতি totemismএর রূপান্তর মাত্র। জ্ঞানানুশীলনের ফলে, আর্য্য অনার্য্যের ব্যবধান ক্রমে দূর হইতেছিল। তাহা না হইলে, ধীবর কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও, ব্যাসদেব পূজার্হ হইতেন না। এই ভাবে লিঙ্গার্চ্চনা (Phallic worship) তন্ত্রোক্ত উপাসনায় পরিণত হইয়াছিল। এখন ভারতের বিভিন্ন জাতির শিক্ষা দীক্ষা, এমন কি, আর্থিক অবস্থা উন্নত করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা, একই ভাবে উচ্চ এবং নীচ সকল বর্ণের মধ্যেই দেখা যাইতেছে। সকলেরই আদর্শ—স্বতন্ত্রতা (self-determination)। দ্বন্দ্ব-প্রবণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিকণা একত্রে মিশিয়া সমাজ-শরীর গঠন না করিলে তাহাতে জাতীয়-জীবন সঞ্চার হইবার আশা নাই। দেশ-নায়কদের কর্ত্তব্য বাঙ্গলার লোকের নবজাতি-

গঠনের মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া। যে এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারই সর্ব্বপ্রকার সুখ সমৃদ্ধি ভোগ করিবার অধিকার আছে, এ কথা বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে। দুই কোটীর অধিক লোক, ২৫ লক্ষ লোকের নিকট "অচল" হইয়া থাকিতে পারে না, থাকিবেও না। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের আশায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথের সারথী হইয়াছিলেন। আমরা চাহিতেছি—"স্বরাজ"। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথে রথের ন্যায় স্বরাজ-রথে "মানব-শক্তি" বসাইয়া, সকল জাতির হাতে রথরজ্জু দিলে, তবে এ রথ চলিবে। যতদিন কেবল উচ্চ জাতির উপর রথ চালনার ভার থাকিবে, ততদিন এ রথ নড়িবে না। এখন আমরা ইংরাজের প্রজা, ব্রীটিস-ইণ্ডিয়ায় বাস করি। আইন-কানুনে জাতিবিশেষের কোন খাতির নাই। যা কিছু খাতির, বিবাহ-সম্বন্ধ নির্ণয়ে এবং পংক্তি-ভোজনে, আর এ দুই বিষয় লইয়াই আমাদের জাত্যাভিমান। আপনাদিগকে চিন্তা করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির গণ্ডি পার হইয়া মহাজাতিতে পরিণত হইতে চাহেন, কিম্বা ভেদনীতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, বিশ্বের মাঝে নগণ্য এবং লাঞ্ছিত রহিতে ইচ্ছা করেন। যাহাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের সাড়া পড়িয়াছে মনে করিয়া বৃদ্ধ বয়সে আশান্বিত হইতেছি, বাঙ্গলার সেই যুবকবৃন্দকে এই সামাজিক-সমস্যা মীমাংসা করিতে আহ্বান করিতেছি। জাতীয় জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে যুবকগণ যদি সৎসাহসের পরিচয় দিয়া শুক্রজনন-শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর না হন, তাহা হইলে দেশের দুর্দ্দিন ঘুচিবার বহু বিলম্ব আছে মনে করিতে হইবে। বিবাহ করিয়া পিতৃ-মাতৃ-ঋণ শোধের দিন আর নাই।

স্ত্রী স্বাধীনতা।

গ্রাম্য স্কুলে পড়িবার সময় কবিবর হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী আমার হাতে পড়ে। বয়স তখন ১২ বৎসরের বেশী ছিল না, কিন্তু কবিতাগুলি এত ভাল লাগিয়াছিল যে, সকল কথার মানে না বুঝিলেও, অনেক কবিতাই কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম—

> ওরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
> এই কি তোদের দয়া সদাচার।
> হয়ে আর্য্যবংশ—অবনীর সার—
> রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে!"

এই কয়েক পংক্তি যে কতবার আওড়াইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। কিছুকাল পরে কাশীতে গেলাম। সেখানে মাতৃদেবী "কুমারী পূজা" করিলেন, দেখিয়া মনে খটকা বাধিল। যাহারা বালিকার চরণপূজা করে, তাহাদের মধ্যে দয়া সদাচার নাই, এ কেমন কথা! দেশে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম, আমাদের পার্শ্বের বাড়ীর একটি বালিকা বিধবা হইয়াছে। গ্রামে অনেক বিধবা আছে, আমাদের বাড়ীতেও বিধবার অভাব ছিল না, সুতরাং এ ঘটনায় বিচলিত হইবার কিছুই ছিল না। গ্রীষ্মকালে রাত্রে একদিন বিধবা বালিকার কাতর ক্রন্দনের রব কাণে আসিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, আমাপেক্ষা বয়সে ছোট সেই বালিকাটি নিরম্বু উপবাসের তাড়নায় অস্থির হইয়াছে দেখিয়া

তাহার মা কাঁদিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও কাঁদিতেছে। বুঝিলাম, মর্ম্মভেদী দুঃখের তীব্রতা নিবারণের জন্য কবি গাহিয়াছিলেন—

'হায় রে নিষ্ঠুর পষাণ-হৃদয়,
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়,
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারী বধ ক'রে তুষ্ট করে দেশাচার
এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ ?"

ইউরোপে ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে রমণীর পদমর্য্যাদা বড় বেশী ছিল না। আইনের চক্ষে তাহাদের অধিকার কিছুই ছিল না বলিলেই চলে। স্বামীর, স্ত্রীর উপর যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল, কন্যাকালে সম্পূর্ণরূপে পিতামাতার কর্তৃত্বাধীনে থাকিতে হইত। অথচ মাতৃমূর্ত্তির পূজা এবং যোনি পূজা প্রায় সর্ব্বদেশেই প্রচলিত ছিল এবং অনেক দেশে এখনও আছে। তান্ত্রিক-যুগে এই পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছিল এবং "কন্যাকেও যত্নে পালন করিবে" এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। আমরা এই উক্তির দোহাই দিয়া, আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতেছি। মনুর বিধান মতে, ভর্ত্তা প্রভৃতি স্বজনেরা দিবারাত্রি মধ্যে কদাপি স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনাবস্থায় অবস্থান করিতে দিবে না, তাহাদিগকে সদা স্ববশে রাখিবে। স্ত্রীজাতি কৌমারাবস্থায় পিতা কর্তৃক, যৌবনে ভর্ত্তা কর্ত্তৃক এবং স্থবির অবস্থায় পুত্র কর্তৃক রক্ষণীয়া। কেবল ভারতে নহে, অনেক দেশেই রমণী অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইতেন। তাহা না হইলে, "স্ত্রী পণ" করিয়া পাশা খেলা চলিতে পারিত না; মৃতপতির কবরে বা সহমরণে যাওয়ার প্রথা প্রচলিত হইত না। একদিকে র‍্যাফেল (Raphæl) এবং লবেনজেটি (Lorenzetti) অঙ্কিত ম্যাডনা-মূর্ত্তির (Madonna) আদর, অপরদিকে জীবন্ত মূর্ত্তির প্রতি অনাদর—কারণ ত বুঝিয়া পাওয়া যায় না। অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী-দার্শনিক Auguste Compte তাঁহার Religion of Humanity বা "মানবত্ব-ধর্ম্ম" প্রচার করেন। তিনি বলিয়াছেন—

"Humanity is but an abstraction and forbids the glow of adoration with which service is touched in all religions which offer a personified object for adoration. As an aid to their faith, nearly all religions recognize sacred symbols, not indeed to be confounded by clearer minds with the original object of adoration, but worthy of reverence in its place as its special representative and reminder. In precisely this sense, the sacred emblem of Humanity is Woman. In woman, Humanity is enshrined and made concrete for the homage of man."

Auguste Comte নারী জাতির যে আদর্শ জনসমাজের সম্মুখে ধরিয়াছেন, উহাতে তাঁহার সময়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না। অষ্টাদশ-শতাব্দীতে, ইউরোপে নারীজাতির অবস্থা, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষা, বিশেষ উন্নত ছিল না। যাঁহারা মনুসংহিতায়

স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধ-মত শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের তুষ্টির জন্য Shakespeare হইতে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"I will be master of what is mine own
She is my goods, my chattels, she is my house,
My house-hold stuff, my field, my barn,
My horse, my ox, my ass, my anything
And here she stands, touch her whoever dare."

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে, ইউরোপে নারী জাতি বিষয়ক ধারণার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে সে দেশের রমণীও পরাধীনা এবং পুরুষের দাসী ভাবে দিন কাটাইতেন। বিবাহিতা রমণীর নিজের কোন civil rights ছিল না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, ইংলণ্ডে "স্ত্রী-ধন" বিষয়ক কোন আইনও ছিল না। কয়েকদিন পূর্ব্বে Englishman কাগজে "গুরুপ্রসাদী" প্রথার আলোচনা হইয়াছিল। তাঁহারা কি জানেন যে Jus Primae Noctos নামক কুপ্রথাই ফরাসী-বিপ্লব সূচনার একটী প্রধান কারণ? Napoleanic Code অনুসারে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তি এবং সমগ্র স্ত্রীজাতি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির মধ্যে গণ্য। রুস দেশে (Russia) এখনও "স্ত্রী ঠেঙ্গান" প্রথা প্রচলিত আছে এবং অনেক স্ত্রী বেত না খাইলে স্বামীসোহাগিনী মনে করেন না। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, জার্ম্মানীতে (Germany) স্বামী, ভৃত্য-বর্গের সম্মুখে, স্বীয় স্ত্রীর বিবস্ত্র নিতম্বে বেত্রাঘাত করিতে আইনতঃ অধিকারী ছিলেন। মধ্য-যুগে জার্ম্মানীতেও "Chastity-Belt"এর প্রচলন ছিল। আমাদের দেশে কিন্তু বহু শতাব্দী হইতে রমণী "দেবী" বলিয়া আদৃত হইয়া আসিতেছেন। যে পরিবারে রমণীর আদর নাই, দেবতা তথায় বাস করেন না, ইহা অতি প্রাচীন কথা। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের দেশের রমণী পদমর্য্যাদায় তাঁহার ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশের ভগ্নী অপেক্ষা হীন ছিলেন না, ইহা দেখান হইল।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানে রমণীর নিকট উচ্চ-শিক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক; তাই, অর্দ্ধশতাব্দির মধ্যে স্বাধীন দেশে যাহা সম্ভবপর, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরতন্ত্রতার মধ্যে এ দেশে তাহা অসম্ভব। যুদ্ধের চারি মাস পূর্ব্বে, প্যারি (Paris) নগরে একজন ফরাসী বিদুষী রমণীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলি যে, ফরাসীরা ম্যালথাসের (Malthus) মতানুবর্ত্তী হওয়ায়, দেশের জনবল যেমন বাড়া উচিত, তেমন বাড়িতেছে না, যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিলে হটিয়া যাইতে হইবে। রমণী হাসিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের ত লোকের অভাব নাই, তবে আপনাদের এমন দুর্দ্দশা কেন? আমরা অকর্ম্মণ্য লোকের সংখ্যা বাড়া দরকার মনে করি না, আমরা কেবল যোগ্য-লোক (fit men) চাই।" স্ত্রী-স্বাধীনতা (emanicipation of women) সম্বন্ধে আলোচনায় বুঝা গেল যে, তাঁহার মতে স্ত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ ইংলণ্ডেই ঠিক ভাবে বিকাশ লাভ করিতেছে; এবং ইহার প্রধান কারণ, সে দেশের চরিত্রবান পুরুষের সংখ্যা বেশী। ফরাসীদেশে অভিভাবিকা সঙ্গে না থাকিলে, অবিবাহিতা রমণী প্রকাশ্য ভাবে

চলাফেরা করিতে পারেন না, আর ইংরাজ রমণীরা অকুতোভয়ে ও অশঙ্কিতচিত্তে যথা ইচ্ছা গমনাগমন করেন। তুরস্ক যে "sick man" আখ্যা পাইয়াছে, অবরোধ-প্রথাই তাহার অন্যতম কারণ। ভারতবর্ষের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "যে দেশের যুবকেরা পরিবার প্রতিপালনে ক্ষমতা না থাকিলেও বিবাহ করিয়া বসে, যৌবনাগমের পূর্ব্বেই বালিকাকে পাত্রস্থ করা যে দেশের শাস্ত্রের ব্যবস্থা, সে দেশ বর্ত্তমান সভ্য জগতে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। সে দেশের লোক চিরকালই পদানত থাকিবে। Let your country have a population of strong and comfortable citizens and let us stand by small number and slow increase of manly men and womanly women" গত যুদ্ধের ফলাফল দেখিয়া এই বিদুষী ফরাসী রমণীর কথা যেন ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া বোধ হইতেছে। মিত্র-শক্তি রমণী-সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া যে যুদ্ধজয়ী হইয়াছেন, ইহা এখন সর্ব্ববাদী-সম্মত। বঙ্গীয়-সমাজ-সংস্কার-সমিতির প্রধান লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য—রমণীর উচ্চশিক্ষা। ইহা কি ভাবে দেওয়া হইবে, দেশ-নায়কেরা সে চিন্তা করিবেন। অবরোধ-প্রথা, নারী-শিক্ষা এবং জাতিগঠনের অন্তরায়। ক্রমে ক্রমে ইহার মূলচ্ছেদন আবশ্যক। যে দেশের রমণী ১০।১২ বৎসরে বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া, "অন্তঃপুরবাসিনী" বলিয়া গৌরব বোধ করেন, সে দেশে রমণীর উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করা যে কত কঠিন, যাঁহারা নারীশিক্ষার উন্নতি কল্পে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই ইহা অবগত আছেন। কলিকাতা সহরে অনেক হিন্দুঘরের মেয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিবার উপযুক্ত এবং সামান্য বেতনে কাজ করিতেও প্রস্তুত আছেন, কিন্তু গাড়ীভাড়ার খরচা এত বেশী পড়ে যে, তাঁহাদের নিযুক্ত করা সম্ভবপর হয় না। ১৫৲ টাকা যাঁহার মাহিনা, তাঁহার গাড়ীভাড়া দিতে হয় ৩০।৩৫ টাকা। এত বাজে খরচ করিয়া নারীশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করা অসম্ভব। বোম্বাই প্রদেশে অবরোধ প্রথার বাড়াবাড়ি নাই, এবং সে দেশে রমণীরা হাঁটিয়া বা ট্রামে যাতায়াত করিতে পারেন। কাজেই নারীশিক্ষা-ক্ষেত্র তথায় দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে। আর আমরা,

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না

কবির এই প্রাণের কথায় কান দিতেছি না। এ সম্বন্ধ আমার কথা আমি শেষ করিলাম। কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন —

"এ হেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ড মাঝে
নাহি কিরে কোন বীরাত্মা বিরাজে,
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড,
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া তবে ?"

"বীরাত্মার" সন্ধান পাইয়াছি এবং আশা করি তাঁহারা হাতিয়ার ঠিক করিয়া সমাজ-সংস্কার-যুদ্ধে অদম্য উৎসাহে অগ্রসর হইবেন।

শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী।

গীতায় বিজ্ঞানতত্ত্ব।

বিজ্ঞান আলোকিত এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চর্চ্চা বোধ হয় কাহারও অপ্রীতিকর হইবে না। কেননা, এই বিজ্ঞানের ও যুক্তি-বাদের যুগে, লোকে বিজ্ঞান ও যুক্তিপূর্ণ বাক্যাতিরিক্ত কোন কথা শুনিতে চান না। তাই আজ—"গীতায় বিজ্ঞানতত্ত্ব"—এই সুসংবাদ উপস্থিত করিতেছি। আমরা হিন্দু; ধর্ম্মই হিন্দুদের প্রাণ, ধর্ম্ম-শিক্ষা আমাদের মজ্জাগত,—আহারে, বিহারে শয়নে, ভোজনে, গমনে আমাদের জীবনের সর্ব্ব কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের কিছু না কিছু সম্বন্ধ আছে। তাই, আজ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মধ্য দিয়া, বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। গীতা-গ্রন্থ সম্বন্ধে আমার কাহারও নিকট পরিচয় প্রদান আবশ্যক করে না। কারণ, হিন্দু মাত্রেই ইহার নাম শুনিয়াছেন, ও যাহার সৌভাগ্য আছে, তিনি পাঠ করিয়াছেন। গীতা সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে—"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ, যা পদ্মমুখ নাভস্য মুখপদ্ম বিনিস্থতা" "সর্ব্বোপ নিষদ গাব"। গীতা পাঠে আমরা কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য (science) শিক্ষা করিতে পারি কিনা, আজ তাহারই কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

২। গীতা যে ভগবৎ উক্তি, ইহাই আমার বিশ্বাস। গীতা যে কেবল হিন্দুর নহে—সমুদায় জাতির—কি হিন্দু কি অহিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি বৌদ্ধ সমুদায় মানব-জাতির সাধারণ-সম্পত্তি, তাহাও আমার বিশ্বাস আছে। যাহারা গীতা গ্রন্থকে ভগবৎ-উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের ইহা মনে রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, ঈশ্বর যখন স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থের সাধারণ স্রষ্টা, তখন তাঁহার শিক্ষায় কখন ঐকদেশিকতা থাকিতে পারে না, কেননা, তিনি সকলের; কাজে কাজেই তাঁহার শিক্ষা, কোন বিশেষ জাতির নিজস্ব নহে, ইহার শিক্ষা, সকল মানব জাতির শিক্ষনীয় ও আশ্রয়নীয়। যাহা হউক, ধর্ম্ম-জগতে গীতার স্থান নির্দ্দেশ এ স্বল্প-বুদ্ধি লেখকের আজ প্রতিপাদ্য বিষয় নহে, আজ আমার প্রতিপাদ্য বিষয়, আবার বলি, গীতা-পাঠে আমরা কোন বৈজ্ঞানিক তথ্যে উপনীত হইতে পারি কি না। আমি কোন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ (scholar) বা অধ্যাপক নহি যে, আপনারা আমার নিকট হইতে বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ সমীক্ষতা আকাঙ্ক্ষা রাখিতে পারেন। তবে গীতা-পাঠে যে কথঞ্চিত সত্য-তথ্য অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই আজ এই পাশ্চাত্য শিক্ষান্বিত মহোদয়গণের নিকট মিষ্টান্ন-রূপে অর্পণ করিতে বাসনা হওয়ায় উপস্থিত হইয়াছি। ভরসা করি, আপনারা যদি কিয়ৎকাল একটু স্থৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, এ বন্ধু স্থানীয় লেখকের কথা মনোযোগ পূর্ব্বক প্রণিধান করেন ত, বড়ই বাধিত হইব।

৩। আমার ধারণা ও বিশ্বাস যে-ধর্ম্মে ও বিজ্ঞানে কোন বিসম্বাদ থাকিতে পারে না। যে ধর্ম্মের মূলে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট নহে, উহা ধর্ম্ম-পদ-বাচ্য নহে; কারণ, যাহা আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক এই উভয়বিধ উন্নতির পথ প্রদর্শক, উহাই ধর্ম্ম-পদ-বাচ্য; "যতো নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" যদি ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের কোনরূপ শত্রুতা থাকিত, তাহা হইলে গীতায়

ব্রাহ্মণের গুণলক্ষণের মধ্যে—"জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিকাং ব্রহ্ম কর্ম্ম স্বভাবজং"—একথা উক্ত হইত না। বিজ্ঞান অর্থে, যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে কোন বিষয়ের বিশেষ বা তৎতৎ প্রকৃতি-গত জ্ঞান জন্মে, ইংরাজিতে বলে—'systematised knowledge'। জল আছে, জল খাইলে তৃষ্ণার নিবারণ হয়,—মানুষের এই যে জ্ঞান, উহার নাম সাধারণ-জ্ঞান। কিন্তু, আমরা যদি জানিতে চেষ্টা করি, এই জল কি কি উপাদানে উৎপন্ন, তখন আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত সাধারণ-জ্ঞান-পথ হইতে কিছু অগ্রগামী হইতে হইবে; এবং, যখন যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিব যে, এই যে জল, উহা দুইটী বায়বীয় পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন, যথা একভাগ অম-জান (Oxygen) ও দুই ভাগ জল-জান (Hydrogen), তখন আমাদের জল সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হইবে,—উহারই নাম বিজ্ঞান। এরূপ প্রণালীতে সমুদায় স্থাবর জঙ্গম যাবতীয় পদার্থের যে বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়, উহার বিশেষ বিশেষ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, যেমন উদ্ভিদ সম্বন্ধে যে বিশেষ জ্ঞান-লাভ, উহার নাম উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বা Botany, স্বর্ণাদি ধাতু সম্বন্ধে যে বিশেষ জ্ঞান, উহার নাম ধাতব-বিজ্ঞান বা Mineralogy, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজ্ঞানের নানা শাখা আছে। ঐ শাখা প্রশাখার এক এক বিশেষ সংজ্ঞা বা নাম আছে।

৪। এখন আমরা দেখিব, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহিত গীতার কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে কি না। আপনারা পড়িয়া থাকিবেন বা শুনিয়া থাকিবেন যে, আমাদের যে এই পরিদৃশ্যমান জড-জগৎ, উহা কতকগুলি মূল ভৌতিক পদার্থের সমবায়ে সৃষ্ট। এই মূল-ভূতের ইংরাজি নাম elements। এই সৃষ্ট-পদার্থ, স্থাবর ও অস্থাবর ভেদে, দ্বিবিধ। আরও শুনিয়া থাকিবেন যে, পদার্থের ধ্বংস নাই, ইহা পরিবর্ত্তনশীল মাত্র। ইংরাজি বিজ্ঞানে বলে—matter is indestructible। আমাদের বিজ্ঞানে, ইহাদের নাম—ক্ষিত্যপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম; অর্থাৎ, earth, water, heat, air and ether এই পাঁচটী মূল-ভূত। এই পঞ্চভূতের পরস্পর সংযোগে বা পরিবর্ত্তনে এই দৃশ্যমান জড়-জগতের সৃষ্টি। আমাদের এই পঞ্চ ভূতের নামে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-বিদ্‌ পণ্ডিত-মণ্ডলী নাসিকা কুঞ্চিত করেন, বা করিতেন এবং বলিয়া আসিতেছিলেন বা এখনও বলেন যে, ভারতবাসী বিজ্ঞানে অজ্ঞ; ভারতবাসী যে পাঁচটী মূল-ভূতের (elements) কথা বলেন, উহারা সকলে মূল-ভূত নহে। যদিও সাধারণ-সমাজে, এই পাঁচটি মূল-ভূত বলিয়া ভারতের বিজ্ঞান-শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু এই পাঁচটীর কোনটাই যে মূল-ভূত নহে, তাহা পণ্ডিত বা ঋষি-সমাজে জানা ছিল। এ কথা যে সত্য, তাহা আপনাদের নিকট আমি ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিব। সাধারণ লোকের বোধগম্যের জন্য, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়-গোচর এই পঞ্চ-পদার্থকে মূল-ভূত (বা elements) বলিয়া গিয়াছেন ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-মণ্ডলী এই পঞ্চভূতের নিগূঢ়ার্থ জানিতে না পারায়, নানা কথা বলিয়া আসিতেছেন। জানি না, আপনারা এই পঞ্চ-ভূতের অন্তার্থ জানেন কি না। যাহা হউক, আমার এখানে এ সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা করা সমীচীন বিধায় আপনাদিগকে কিছু বলিব। প্রথমতঃ, ক্ষিত্যপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোম, স্বরূপতঃ কেহ মূল-ভূত নহে—ইহা এক মহা-ভূতের বিকারমাত্র। জড় জগতে উহাদের উপাধি থাকিলেও, সূক্ষ্ম বা

কারণ-জগতে উহাদের মৌলিকতা নাই। আর, এই যে বাক্যবিন্যাস, ইহা কেবল আমাদের শস্যশ্যামলা ধরণীর উৎপত্তি-জ্ঞাপক বাক্যাবলী মাত্র। তাহা উপনিষদের উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"আকাশ বৈ ব্রহ্ম তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ, আকাশাৎ বায়ু, বায়োরগ্নি, অগ্নেরাপ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" অর্থাৎ আদি ব্রহ্ম বা আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান nebular theory বা নীহারিকা-বাদের বা ether-বাদের মূল-ভিত্তি যে আমাদের উপনিষদ্, তাহা আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন। জগৎ সৃষ্টির এই মত এখন সর্ব্ববাদী সম্মত; কাজেই, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মত, আমাদের ভারতের ঋষিদিগের মতেরই পুনরুক্তি মাত্র। এখন আপনারাও বোধ হয় বুঝিলেন যে, এই ক্ষিত্যপ তেজ মরুৎ বোমাত্মক যে পঞ্চভূতের নামে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নাসিকা কুঞ্চন, তাহা আমাদের শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ গ্রহণে, তাঁহাদের অসমর্থতাই একমাত্র কারণ। আসুন আমরা দেখিব, পূর্ব্বতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগুলো যে পঞ্চভূতের নাম শুনিয়া এতাবৎ নাসিকা কুঞ্চন করিতেছেন, উঁহাদের বিজ্ঞানের দৌড় কতদূর। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে ৭০টী মূল ভূত বা (elements) এবং এই জড়-জগৎ উক্ত ৭০টী পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে সৃষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, ইহাই অভ্রান্ত ধারণা ছিল। কিন্তু অল্পদিন হইল, বিজ্ঞান ধুরন্ধর Sir William Crooks সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, রসায়ণ শাস্ত্রে যে ৭০টী মূল ভূত বা elements ছিল, উহারা কেহই প্রকৃতপক্ষে ভূত নহে। উহারা Protyle নামক চরম-ভূতের বিকার মাত্র। এই (Protyle) প্রোটাইল জগতের নির্ব্বিশেষ বা homogeneous উপাদান, ইহারই সংযোগে জড-জগতের উৎপত্তি ও বিশ্লেষণে জগতের ধ্বংস। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, যাহা ৭০টা মূলভূত বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, তাহা অখণ্ড পরমাণু বা atom নহে; উহারা কেহ স্বাধীন নহে, যেমন খড়ের আঁটিতে একটা গাদা তৈয়ার হয়, ইহাও তদ্রূপ। হায়! Crook সাহেব তুমি কি করিলে। অভ্রান্ত-ধারণাকে আবার ভ্রান্তিতে পরিণত করিলে! মনীষী Crooks-এর এ সিদ্ধান্ত আমাদের শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। যদিও তাঁহার এ প্রোটাইল (Protyle) সংস্কৃত-বিজ্ঞানের প্রকৃতির ঠিক প্রতিশব্দ নহে, তথাপি উহাকে একাভিধানিক শব্দ বলিতে পারা যায়। যাহা হউক, প্রকৃতি বা Protyle যে জড়-জগতের মূল উপাদান, তাহা সাংখ্য-সূত্র হইতে আমরা জানিতে পারি। যথা—"প্রকৃতে সর্ব্বোপদানতা মূলে মূলাভাবাৎ অমূলংমূলং।" বিজ্ঞান-শাস্ত্র বলে যে, এই প্রকৃতির (matter) হ্রাস বৃদ্ধি বা ধ্বংশ নাই, তাই সাংখ্য-সূত্রকার বলিয়াছেন—নাসদং উৎপদাতে নসদ্ বিনিস্যতি। এখন আপনারা আসুন আমরা দেখিব, গীতায় এ সম্বন্ধে কি উক্ত হইয়াছে। আমরা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখি যে ভগবান্ আত্মা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

অচ্ছেদ্যোঽয়ং অদাহ্যোঽয়ঃ অক্লেদ্য অশোষ্য এব চ।
নিত্য সর্ব্বগত স্থান অচলোঽয়ং সনাতন
অব্যক্তোঽয়ং অচিন্ত্যোঽয়ং অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।

অর্থাৎ স্থায় (আত্মা)-অথবা সাংখ্যোক্ত পরমাণু (যাহাকে ইংরেজিতে bi sexual atom

বলে) ইহাই জগতের মূল কারণ, উহা নিত্য ও সৎ। অন্যত্র গীতায় উক্ত হইয়াছে—"অণোরনীয়াং মহতোমহীয়াং" অর্থাৎ ভগবান অনুর অণু বা সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম ও বৃহৎ হইতে বৃহত্তম। এই জড়-পরমাণু ছাড়া অন্য একটি পদার্থ আছে, উহার বৈজ্ঞানিক নাম force, energy বা power। আমরা যদি জাগতিক-শক্তিকে বিশ্লেষণ করি ত দেখিব, ঐ শক্তি বা force, নিম্নলিখিত ছয় ভাগের কোন একটা না একটার অন্তর্গত। ঐ ছয় অংশের ইংরাজি নাম motion, light, heat, electricity, magnatism and chemical affinity। যদিও এই ষড়বিধ শক্তি ব্যবহারিক-জগতে বিভিন্ন, কিন্তু বস্তুতঃ এক। সেই জন্য, Professor Love has asserted that these are identical, Dr. Buchner also affirms that these imponderable bodies, such as, light, heat etc, are neither more or less than modification of the aggregated conditions of matter। এই যে ছয়টি শক্তি আছে, ইহা ছাড়া আরও দুইটী শক্তি আছে, উহাদের একের নাম প্রাণ-শক্তি বা vital force ও অপরের নাম জীবনশক্তি বা psychic force। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ইউরোপীয় বিজ্ঞান মতে আটটী শক্তি আছে। বহুকাল ধরিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের ধারণা ছিল, ইহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বা independent and separate। কিন্তু কয়েক বৎসর গত হইল, Prof. Sir William Grove পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত ষড়বিধ ভৌতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। অর্থাৎ heat (উত্তাপ) electricity (বিদ্যুৎ) light (আলোক) ইত্যাদিকে এক পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে। এই যে প্রক্রিয়া বা process ইহার নাম correlation of physical forces। পরে, অধ্যাপক হার্বাট স্পেনসার (Herbert Spencer) ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, শুধু যে এই ভৌতিক-শক্তিকে সমাবর্দ্ধন (conservation of energy) করা যায় তাহা নহে, প্রাণ-বা জীব-শক্তিকেও এ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রোফেসর ডল্‌বিয়া (Dolbear) ইহাও বলিয়াছেন—"Each force is transferable directly or indiretly into matter. They differ from each other chiefly in the character of motion involved in the Phenomena।" তাহা হইলেই মোটের উপর দাঁড়াইল, একশক্তি; যাহার পরিবর্ত্তনে বা বিবর্ত্তনে এই পরিদৃশ্যমান জড়জগতের সৃষ্টি। এই যে মহাশক্তির কথা আমরা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান হইতে জানিতে পারি, এ সম্বন্ধে আমাদের গীতায় কিছু আছে কি না, দেখা যাউক। আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের স্থূল দৃষ্টিতে, দুই পদার্থের সমবায়ে যে এই জড়-জগতের উৎপত্তি, তাহা দেখিলাম। অর্থাৎ matter বা protyle এবং দ্বিতীয়, force বা power। গীতায় সপ্তম অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

ভূমেরাপোনলো বায়ুঃ খং বুদ্ধি মনয়েবচ
অহংকারঃ ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।

অর্থাৎ, ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুৎব্যোম মন বুদ্ধি ও অহংকার এই অষ্ট-জড়, প্রকৃতির উপাদান। এই অষ্টপ্রকার উপাদানের নাম গীতায় "অপরা বা inferior প্রকৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া, ভগবানের আর এক প্রকৃতির উল্লেখ আছে, যাহার নাম পরা-প্রকৃতি বা

higher self। "অপরেয়ং ইতস্তত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" অর্থাৎ, তাঁহার যে higher (পরা) প্রকৃতি আছে, উহারই দ্বারা জগৎ ধৃত বা রক্ষিত হয়। The universe is upheld by this vital force। আপনারা আমাদের সৃষ্টি-তত্ত্ব বিষয়ক শাস্ত্রাদি পড়িলে দেখিতে পাইবেন যে, এই যে ভূতের বা elementsএর নাম করা হইল, ইহারা সেই এক মহাশক্তির বা জগদীশ্বরের সসৃক্ষাশক্তির ক্রম-পরিণতির অবস্থা-মাত্র। ক্ষিত্যপ্‌তেজ মরুৎব্যোম ইহাদের বহির্জ্জগতে বিভিন্ন নাম থাকিলেও, উপাধি-গত ভেদ থাকিলেও, উহারা স্বরূপতঃ এক। উহারা পূর্ব্বোক্ত protyle প্রোটাইল বা এক জড়-প্রকৃতির বিকার মাত্র। Heat, light, ইত্যাদি সকলেই সমাবর্ত্তনীয় বা interchangable। জড়-জগতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর জ্ঞান বিশেষরূপে উন্নত হইলেও, আধ্যাত্ম-জগতে উহাদের জ্ঞান ভারতীয় ঋষিদের জ্ঞানের সোপানের অনেক নিম্নস্তরে অবস্থিত, কারণ, এখন পর্য্যন্ত লর্ড কেলভিন্ (Lord Kelvin)এর মত মনীষী ধারণা করিতেই পারেন না যে, এই জড়-জগৎ ব্যতিরিক্ত, আর এক সূক্ষ্ম-ও কারণ-জগৎ আছে। যাহা হউক, এখানে আমাদের শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি তত্ত্বের ব্যাখ্যা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভগবানের (বা সাংখ্যোক্ত চরম প্রকৃতির) সাম্যাবস্থার (সত্ত্ব রজ তমঃ) homogeneous conditionএর ব্যতিক্রম ঘটিলেই, (যখনই তাঁহার সসৃক্ষা হয় তখনই এরূপ ঘটে) তাঁহার যে পরিণাম ঘটে, উহার নাম "মহত্তত্ত্ব"। এই মহত্তত্ত্বের বিকারের নাম, অহংকার-তত্ত্ব (egoism), তাহার ফলে, ক্ষিত্যপ্‌ তেজ্‌ মরুৎব্যোম ইত্যাদির সূক্ষ্ম তন্মাত্রের, যথা—শব্দ-তন্মাত্র, স্পর্শ-তন্মাত্র, রূপ-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্রের আবির্ভাব হয়। তাহা হইতে এই জড়জগতের সৃষ্টি। এখন আমরা দেখিলাম ইংরাজী বিজ্ঞানমতে যেমন দুই পদার্থের—matter ও forceএর—রাসায়নিক সংযোগে এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, গীতার মতেও ভগবানের পরা ও অপরা দুই শক্তির সংযোগে জগতের সৃষ্টি। যদি আর একটু অনুধাবন করেন ত দেখিবেন যে, matter আর force পুরুষ প্রকৃতি, উহারা inseparable বা অভিন্ন। অর্থাৎ যেখানে matter বা জড় প্রকৃতি, সেইখানেই force বা পুরুষ। শক্তি পুরুষেরই, জড়ের নহে। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলে—"শক্তি শক্তিমাতার-ভেদ"। ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলিতেছেন—No matter without force, no force without matter—matter and force are co-existent and inseparable। ইহাই আমাদের আধ্যাত্মিক রূপকের শিব-শক্তি বা রাধা-কৃষ্ণ মূর্ত্তি। পূর্ব্বোক্ত অষ্টাপ্রকৃতি ভগবানে আশ্রয় করিয়া যে নিত্যস্পন্দনে বা vibrationএ এ জগৎ সৃষ্টি করিতেছে, ইহাই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিযুগল বিশ্ব-কদম্ব-বৃক্ষের-মূলে সদা নিত্যলীলায় বিরাজমান। আর উহাদের পাদদেশ দিয়া প্রেমযমুনা নানা লীলা তরঙ্গে প্রবাহমানা। যে তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্ত, একদিন ভগবান এই ভারতবাসীর প্রতি অসীম কৃপাপরবশ হইয়া যমুনাপুলিনে স্বশরীরী হইয়া রাসলীলায় জগৎবাসীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এ পৃথিবীর মধ্যে, এ সৌভাগ্য আমাদের একবারমাত্র ঘটিয়াছে; তাই বলি, ভারতবাসী তোমরা ধন্ত। একমাত্র তোমরাই জাগতিক লীলায় এ অপার্থিব ছবি ভক্তিপ্লুত মনে হৃদয়ে

অঙ্কিত করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে। যাহা হউক, বিজ্ঞান-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে গিয়া হঠাৎ অন্যপথে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, ক্ষমা করিবেন। এখন আমরা আমাদের গন্তব্য পথে পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হই। এই যে প্রকৃতির বিকাশ, উহা ভগবানের বিভব মাত্র। এই দুই ভাবকে different modes of manifestation বলে। গীতায় অন্যত্র এই দুই ভাব ক্ষর-ও অক্ষর-পুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

এতৎ যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণিত্যুপ ধারয়।

দ্বাবিমৌ পুরুষে লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।

ক্ষর সর্ব্বাণি ভূতানি কুটস্থোঽক্ষর উচ্যতে।

ভগবান এই "ক্ষর" "অক্ষরের" (অর্থাৎ, matter ও force বা পুরুষ প্রকৃতির) অতীত; তাই, তাঁহার নাম "পুরুষোত্তম"।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ

অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

প্রলয়ে এই পুরুষ প্রকৃতি (matter and force) পরমেশ্বরে লীন হয়, তখন তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং।" তাই উপনিষদ বলিতেছেন—অক্ষরং তমসি লীয়তে তমঃ পরে দেবে একী ভবতী। এ ভাব কেমন জানেন, যেমন লৌহের অবস্থা, উহাতে চুম্বক-শক্তি magnetism—positive ও negative এ উভয় ভাব প্রচ্ছন্নভাবে বা basic conditionএ থাকে। ইহাও তদ্রূপ-বস্থাপন্ন। এই অবস্থাকে ভগবানের যোগনিদ্রা বলে। এই যে পুরুষ প্রকৃতির দ্বারা জগৎ সৃষ্টি ব্যাপার বর্ণিত হইল, গীতার অপর ভাষায় "ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ" বলে, আর তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি, "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।"

এই সমুদায় ভগবৎ-উক্তি হইতে ইহাই কি প্রতিপন্ন হইতেছে না যে, কি স্থাবর কি জঙ্গম কি উদ্ভিদ কি ধাতব সমুদায় সৃষ্টি পদার্থের মধ্যে ভগবান্ অনুস্যূত রহিয়াছেন। ভগবানের এই যে চৈতন্য শক্তি, ইহার ভিন্ন ভিন্ন উপাধি আছে, যথা—জীবাত্মা, খনিজাত্মা উদ্ভিদাত্মা। তাই ভগবান বলিয়া গিয়াছেন—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্বং স্থাবর জঙ্গমং।

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎতদ্বিদ্ধিভরতর্ষভ ॥

এই জন্য, যে সকল পণ্ডিতেরা স্থাবর পদার্থকে অচেতন বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। যেহেতু, এই সমুদায় পদার্থের অন্তরে পুরুষ বা ভগবৎ-শক্তি রহিয়াছে। যদি না থাকিত, তাহা হইলে কি আমরা উহাদের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ (attraction ও repulsion) শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাইতাম? এই ভগবৎ-বাক্যে প্রতিধ্বনি করিয়া আজ মাননীয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় ইউরোপ ক্ষেত্রে যে জয়ধ্বনি পাইতেছেন, তাহা আমাদের কম গৌরবের কথা নহে। তবে তাঁহার যে এই আবিষ্কার ইউরোপ-খণ্ডে নূতন হইলেও, ভারতে নূতন নহে। তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। ভগবৎ-উক্তি ত পরের কথা, আমাদের বাঙ্গালার বৈদ্যকুলচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত চরক-সংহিতার আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা নামক টীকায় উদ্ভিদের যে মানুষের ন্যায় দর্শন, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি আছে, তাহা জগতবাসীকে

ভেরীনাদে জানাইয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ-দীপিকা হইতে দেখি, তিনি কি সত্য-তথ্য জগৎকে বলিয়া গিয়াছেন। তিনি উদ্ভিদের চেতনত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"অপ্র-সংজ্ঞা সমস্তেতে সুখদুঃখ সমন্বিতা"

অত্র—সেন্দ্রিয়ত্বেন বৃক্ষাদীনাং অপি চেতনত্বং বোধব্যং

তথাহি, সূর্য্যভাক্তায়া যথা যথা সূর্য্য ভ্রমতি, তথা তথা ক্রমাৎ দিবাং অনুমীয়তে। ইহাই কি আমাদের দেশের সূর্য্যমুখী ফুলের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সপ্রমাণ করিতেছে না? দ্বিতীয় শ্লোকে তথা তবলী মেঘস্তনিত শ্রবণাৎ ফলবতী স্যাৎ" ইহা কি উদ্ভিদের (নোড়বৃক্ষের) শ্রবণশক্তির বর্ত্তমানতা সপ্রমাণিত করিতেছে না, তৃতীয় শ্লোকে, বীজপূবকমপি শৃগালাদি রসাগন্ধে নাতীব ফলবৎ ভবতি" ইহা দ্বারা কি সপ্রমাণিত হইতেছে না যে, বাতাবি লেবু গাছের গন্ধ-গ্রহণ করিবার শক্তি আছে। অপর বাক্যে, "চ্যুতানাং মৎস রসাসেকাৎ ফলাঢ্যত্বা রসনমনুমীয়তে"—অর্থাৎ ইহা দ্বারা আম্রবৃক্ষের রসনেন্দ্রিয়ত্বের প্রমাণ দিতেছে। চক্রপাণি দত্ত বিনাপরীক্ষায় এ সব তথ্য, পুস্তকে স্থান দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। তবে যে সব যন্ত্রাদির সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত তথ্য উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ কালকবলিত হইয়াছে। এইরূপ কত বিষয় যে বিদেশীয় আক্রমণে ও কীটদষ্ট কালের কুক্ষিগত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে মনীষী জগদীশবাবু যে নানা যন্ত্রাদি সাহায্যে ও নিজ বিপুল প্রতিভা ও অধ্যবসায়ে এই সব সত্যের পুনরুদ্ধার করিয়া, পাশ্চাত্য-জগতে ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি ভারতবাসীর আন্তরিক ধন্যবাদাহ। প্রার্থনা করি, তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া অধঃ-পতিত ভারতের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকুন।

এখন আমরা দেখিব, গীতাপাঠে আর কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য জানিতে পারি কি না। আপনাদের, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য-জগতের বিজ্ঞানবিদ্গণের ধারণা এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি আছে—উহা Sir Isaac Newton (সার আইজাক নিউটন)এর আবিষ্কৃত। পাশ্চাত্য-জগতে, মহাত্মা Newton (নিউটন) যে এ তথ্য আবিষ্কার করেন, তাহা সত্য। তজ্জন্য ইউরোপবাসী তাঁহার নিকট চিরঋণী। কিন্তু তৎসঙ্গে যে আমার ভারতবাসী ভ্রাতারা সেই সুরে সুর মিলাইয়া ধন্য ধন্য করিয়া সুখ্যাতি-প্রচারে উৎগ্রীব, তাহাই দুঃখের বিষয়। অবশ্য আমি একথা বলিতেছি না যে, গুণীর গুণ-গ্রহণ, জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই স্বীকার্য্য নয়। তবে, আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে, ইউরোপ-খণ্ডে যে সকল সত্য-তথ্য, কিবা বৈজ্ঞানিক, কিবা দার্শনিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ভারতে অবিদিত ছিল না। তাহার অধিকাংশই এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারত হইতেই গৃহীত,—তবে উহা কেবল মাজা ঘসা ও সংস্কৃত মাত্র। যে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কারের জন্য নিউটনের ধন্য ধন্য ধ্বনি কর্ণকুহর বধির করে, তাহা কি গীতায় স্পষ্ট উক্ত হয় নাই? ভগবান গীতায় বলেন নাই কি যে—"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্য মহোজস" অর্থাৎ, আমি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-রূপে সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাদি ধারণ করিয়া আছি। তাই বলি, আপনারা আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবেন না। তাই বলি, আমরা আমাদের

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করি, একবার জাগরিত হই ও দেখি যে আমরা জগৎ-পূজ্য ঋষিদের সন্তানসন্ততি ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায় সংস্কৃত শিক্ষার দ্বার—যাহা সংকীর্ণতার যুগে বন্ধ ছিল,—আজ তাহা আশূদ্র সকলের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। আপনারা সকলে সংস্কৃত পড়ুন, উপনিষদ ও গীতাদি সত্যশাস্ত্র পড়ুন ও অধঃস্তন সন্তান সন্ততিদিগকে পড়ান। সংস্কৃত-শিক্ষা, দেশের ভাষা শিক্ষা ভিন্ন আমাদের কেবল মাত্র বিদেশীয় ভাষা শিক্ষায় উন্নতি নাই। হায়! আমাদের অশিক্ষার কারণ, আমরা ভিক্ষান্নের জন্য অন্যত্র দণ্ডায়মান। ইহা কি কম ক্ষোভের ও আক্ষেপের বিষয়। আমাদের ভাণ্ডারে অসংখ্য রত্ন থাকিতেও, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আয়াসাভাবে পরদ্বারে একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালায়িত। তাই আবার বলি, এস, ভারতবাসী আমরা আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিগাথা স্মরণ করিয়া, ভগবদ্‌পদে মতি রাখিয়া, প্রকৃতশাস্ত্রের আলোচনা করি। এ আলোচনা করিতে হইলে কেবল বিদেশীয় ভাষা শিক্ষায় হইবে না;—এ আলোচনা করিতে হইলে সেই এক মহাত্মার কথা—"A man's knowledge is incomplete unless he reads his classical language" স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। তাই আমাদের গীতা-উপনিষদাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। আর এক নিবেদন করিয়া, অদ্যকার প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। এ অনুনয় আমার ভ্রাতৃস্থানীয় যুবকমণ্ডলীর প্রতি। আমার একান্ত অনুনয় যে তোমরা বাজে নাটক নভেল পড়িয়া বৃথা কালক্ষেপ করিও না. এখন ইংরাজ-বাহাদুরের অনুগ্রহে ভারতের অভ্যুদয়ের ও জাগরণের সময় আসিয়াছে. মিথ্যা গল্পের বই পড়িয়া, মিথ্যা কল্পনা-রাজ্যে বাস করিও না। যে সকল গ্রন্থপাঠে প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চা হয়, সত্যের আলোচনা হয়, কুসংস্কার দূরীকৃত হয়, এরূপ বিজ্ঞানানুমোদিত পুস্তক পাঠ কর, যে সকল পুস্তকপাঠে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়, ইহাই অনুশীলন কর।

শ্রীরাজকিশোর রায়।

আশার বাণী।

"পুরাণ চলিয়া যায়—
অশ্রু সজল মৌন পরাণ নূতনের পথ চায়"

জগতের গতিই এই। এক যাইতেছে আর এক আসিতেছে। কাল স্রোত কখনও স্থির থাকে না—অবিরাম গতিশীল। ইহার মধ্যে যে তাহাকে যতটা নিজের কাজে লাগাইতে পারে, তাহার কাছেই সে ধরা দেয়। পুরাতন বৎসর সুখ দুঃখ, বিষাদ আনন্দ আশা ও নিরাশার স্মৃতি বক্ষে লইয়া কালের অঙ্কে মিলাইয়া গেল। নূতন বৎসর সসঙ্কোচে ধীরে ধীরে পাদক্ষেপ করিতেছে। অতীতের স্মৃতি বুকে লইয়া, আমরা তাহার দিকে তাকাইয়া আছি। এবৎসর কি ভাবে জীবন-স্রোত চালাইব, আজ মনে এই প্রশ্নই জাগিতেছে।

বুকে আশা বাঁধিয়া, কত লোক আম্র-পল্লব মঙ্গলঘট দিয়া নূতন বৎসরকে বরণ করিয়া লইতেছেন, কেহ বা, নিরাশ নিরুদ্যম বিমর্ষ হইয়া রহিয়াছেন। আমাদের আন্তরিক আগ্রহ উদ্যমে সজীবতা ও সরসতা না থাকিলে, শুধু আম্র-পল্লব ও মঙ্গলঘটে কি কোন সার্থকতা হইবে? কিন্তু কি করিয়াই বা নূতন উৎসাহে নূতন উদ্যমে আমরা প্রদীপ্ত হইব? আমাদের যে

"উৎসাহ নাহি আর, জীবন গুরুভার
কেবলই হাহাকার হৃদয় বিমর্ষ।"

আমাদের যে ঘরে অন্ন নাই, পরিধানে কাপড় নাই, হৃদয়ে প্রাণ নাই। তদুপরি দেশ জননীর যে ললাট-তিলক-সদৃশ কতগুলি সন্তান উপর্যুপরি তাঁহার ক্রোড় শূন্য করিয়াছেন। দেশমাতা এই যে এক একটী সাগরসেঁচা রত্ন হারাইয়াছেন তাহা আর কবে পূর্ণ হইবে কে জানে?

আবার, শত দুঃখেও মানুষ ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া বাঁচিয়া থাকে। এই যে দেশে, যে বন্যার স্রোত দুকূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে ইহাই জননীর আশা। মৃতপ্রায় দেশে জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই তাহাতে একটু না একটু যোগ দিয়াছেন, ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন—ইহা তুচ্ছ কথা নয়। পৃথিবীতে কোন জিনিসই বৃথায় যায় না। ১৫ বৎসর পূর্ব্বে যে বন্যা বাঙ্গলা দেশকে ভাসাইয়া নিয়াছিল, আজ আবার এতদিন পর তাহা ভারতের দুই কূল ছাপাইয়া ছুটিয়াছে। অবশ্য জোয়ারের পর ভাঁটা আসিবেই, কিন্তু জোয়ারের বা বন্যার জলে কূল ছাপাইয়া যে পলি ফেলিয়া যাইবে তাহাতে জমি উর্ব্বরা হইবেই।

এখন আমাদের ভাবিতে হইবে এই জমিতে কোন্ বীজ বপন করিলে ভাল ফসল পাওয়া যাইবে, স্থায়ী ফল হইবে।

প্রেম ও চরিত্র মানুষকে প্রকৃত মানুষ তৈয়ার করে; সকলেই জানেন একজন বহু ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমশালী লোক অপেক্ষা একজন খাঁটি প্রেমিক লোকের সম্মান কত বেশী ও তাঁহার নিকট মানুষ কত সহজে অবনত হয়, এমন কি আত্ম বিক্রয় করিয়া থাকে। তাহার প্রমাণের জন্য আজ আর বেশীদূর যাইতে হইবে না। মহাত্মা গান্ধিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিসের জোরে, দেশশুদ্ধ লোক তাঁহার কথায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত—তাঁহার মনুষ্যত্বে, ত্যাগে ও নিঃস্বার্থ প্রেমে।

আমাদের আশার বাণী এই যে, আজকাল লোকের প্রেমের ক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। পরিচিত লোকের তো কথাই নাই, অচেনা অজানা লোক ও বিপন্ন হইলে মানুষ আজকাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রায়ই তাহার সাহায্য করিতে ছুটিয়া থাকে। এই যে লোকের সহানুভূতি ও সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি ইহা সামান্য জিনিস নহে। অবশ্য উৎপীড়ন ও যে নাই তাহা নয়, তবে ক্রমশঃই মানুষ, গৃহের বাহিরে ও তাহার ভালবাসার পাত্র আছে, ভাই ভগিনী আছে, কিছু করিবার আছে তাহা বুঝিতে ও তাহাদের জন্য ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। তারতম্যানুসারে বিচার করিলে আশার বাণীই শোনা যায়। একবার দেশের ভাইকে

ভাই বলিয়া চিনিতে ও বুঝিতে পারিলে আর ভয় নাই, ভাবনা নাই। প্রেম যে জীবনের উৎস।

আর চাই আত্ম-প্রত্যয়, নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস ও নিজের প্রতি শ্রদ্ধা। আমরা যদি আপনাদের শ্রদ্ধা করিতে শিখি, আমাদের দ্বারা কোন হীন কাজ, কোন প্রকার অপরকে ফাঁকি বা নিজের বিবেককে ফাঁকি দেওয়া কখনও সম্ভব হয় না। অতি সামান্য অন্যায় কাজ করিতে ও মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। এ কথায় ইহা বুঝাইবে না যে আমরা অহঙ্কারী হইব বা অন্যাপেক্ষা নিজেকে বড় মনে করিয়া গর্ব্ব করিব। আত্ম-অভিমান ও আত্মপ্রত্যয় এক কথা নয়। ইহা শুধু নিজের প্রতি নিজের দায়িত্ব জ্ঞান বাড়ান। হৃদয়ে যদি সকলের প্রতি প্রেম ও নিজের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান ও সমালোচনা এক সঙ্গে থাকে তবে অহঙ্কার আসিতে পারে না। আমরা সকলে মিলিয়া প্রত্যেকেই মাতৃপূজার এক একটী উপকরণ হইয়া মাতৃপূজা যজ্ঞ সফল করিব। প্রত্যেকেই আপনাকে দরকারী বলিয়া মনে করিব। সাধারণতঃ দেখা যায়, যেখানে মিলিত শক্তির দরকার আমরা সেখানে আপনাকে পিছনে রাখিতে চাই। এত লোক আছে, আমি না হইলেও চলে, আমার সাহায্যের তেমন প্রয়োজনীয়তা নাই বা না হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, এরূপ ভাবিয়া থাকি। উপমাচ্ছলে, রাজার দুধের পুষ্করিণীর কথা বলা যাইতে পারে। এইরূপ মনে করার জন্যই ত রাজার সাধের দুধের পুষ্করিণী দুধের পরিবর্ত্তে জলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রত্যেকেই মনে ভাবিয়াছে, সকলেই তো দুধ আনিবে, আমি একজন জল দিলে কেহই বুঝিতে পারিবে না বা কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু এই আত্ম-প্রতারণা বা নিজেকে নগণ্য মনে করা যে কতদূর ক্ষতিকারক, তাহা, যখন ঐরূপ সম্মিলিত শক্তির দরকার হয়, তখনই বোঝা যায়। ইহাতেই মানুষ নিজেকেও ফাঁকি দেয়, অন্যকেও ফাঁকি দেয়।

রাবণ-গৃহে বন্দিনী সীতাদেবীকে উদ্ধার করিবার সময় রামচন্দ্র ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর সাহায্যে, সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে যে, রামচন্দ্র বিষ্ণুর অংশ ছিলেন, কাজেই তিনি ইচ্ছা করিলে একাই সব করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতো তিনি করেন নাই বা পারেন নাই। অতি তুচ্ছ কাঠবিড়ালী ও বানর হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই তিনি তাঁহার অতি প্রয়োজনীয় ও সাহায্যকারী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারাও যথাশক্তি তাঁহাকে সাহায্য করিয়া আপনাদিগকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছিল। আমাদের আপনাদের বা আমাদের ভাই ভগিনী কাহাকেও তুচ্ছ বা সামান্য মনে করিলে বা তাহার সাহায্য অপ্রয়োজনীয় বা না হইলে ও চলিতে পারে, মনে করিলে চলিবে না। আমাদের পরপদানতা দুঃখিনী দেশমাতার যদি মঙ্গল সাধন করিতে চাই, তাঁহার দুঃখ যদি ঘুচাইতে চাই, অশ্রু যদি মুছাইতে চাই, তবে আমাদের প্রকৃত খাঁটি মানুষের সম্মিলিত শক্তির দরকার। এ শক্তি অর্জ্জন করিব কি করিয়া? প্রেমে। প্রেমই জীবন। প্রেম ভিন্ন কেহ কাহাকেও পাইব না। ক্ষুদ্র হউক, সামান্য হউক দেশের একটী প্রয়োজনীয় সন্তান বলিয়া নিজেকে যদি মনে করিতে পারি, দেশের ভাই ভগিনীর প্রতি নিজের মনে যদি অকপট প্রেম জাগাইতে পারি তাহা হইলেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে, বাসনা

কামনা পূর্ণ হইবে। খবরের কাগজে বা লোকমুখে নাম চাহিব না, কিন্তু গোপনে খাঁটি প্রেমিক, খাঁটি মানুষ হইব। আমরা শুনিয়া থাকি ও বলিয়া থাকি আমাদের তেত্রিশ কোটি দেবতা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তেত্রিশ কোটী দেবতার পরিচয় বা সন্ধান কেহই পাই নাই। ভারতের তেত্রিশকোটী নরনারীকে যদি আমরা প্রত্যেকে, আমাদের তেত্রিশকোটী দেবতা বলিয়া মানিয়া লইতে পারি ও সেই হিসাবে যতটুকু সাধ্যায়ত্ত, তাহার সেবা করিতে পারি—তবে দেশজননীর শোকের অশ্রু কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারিব।

যে জাগরণ দেশে আসিয়াছে, তাহাকে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। তাহাকে নিস্ফল হইতে দিলে চলিবে না। ইহা হইতেই, ধীরে ধীরে আমাদের মনুষ্যত্বের বীজের সুফল ফলিবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যেদিন উত্তমর্ণের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া, দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, সেই রাত্রিতে স্বপ্নে শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহার স্বর্গীয়া জননী দেবী তাঁহাকে বলিতেছেন "বৎস, কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।"

আমরাও দেশমাতার নিকট হইতে এই সুমধুর আশীর্ব্বাদ বাণী শুনিতে চাই। যাহাতে ঐরূপ হইতে পারি, আমরা আজ নূতন বৎসরে এই ব্রত গ্রহণ করিব ও প্রত্যেকে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে তিলে তিলে চেষ্টা করিতে থাকিব। যেন জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের অবসানে শুনিতে পাই, দেশমাতা আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারণ করিতেছেন—

বৎস, কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।

শ্রীনলিনী দেবী।

পারমার্থিক সত্য ও ব্যবহারিক সত্য।

অনেক সময়ে দেখা যায়, কোন বিষয় বিচার কালে, যাহা পারমার্থিক সত্য ও যেটা ব্যবহারিক সত্য তাহার পরস্পর বিভিন্নতা স্মরণ না রাখিয়া সিদ্ধান্ত করায়, তাহা ভ্রম-পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। যে সকল বিষয়ের ব্যবহারিক সত্তামাত্র লক্ষ্য, তথায় পারমার্থিক সত্যের যে উদ্দেশ্য তাহা যে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, তাহা মনে রাখা উচিত। ব্যবহারিক সত্যের প্রয়োজন, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যাপারে। দুই চারিটী দৃষ্টান্ত এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলে, বিষয়টী বিশদ হইবে। মনে করুন, যে আমরা সময়ের বা কালের পরিমাণ করিতে চাই। তাহা হইলে, বিবেচ্য এই যে, কি বিশেষ উদ্দেশ্যে সেই পরিমাণটা দরকার। যদি ঐ পরিমাণের উদ্দেশ্য কেবল কোন নিরূপিত স্থানে উপস্থিত হওয়া এবং তথায় কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা হয়, তাহা হইলে, সে পরিমাণ, তখনকার উদ্দেশ্য অনুসারেই, করিয়া থাকি। যথা,—দশ ঘটিকার সময় আমার কোন চাকুরী উপলক্ষে কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। ঐই দশ ঘটিকার সময় নির্ব্বাচনের জন্য আমরা সচরাচর একটি ঘটিকাযন্ত্র দেখিয়া, সময়মত উপস্থিত হইবার আয়োজন করি। কিন্তু, কোন দুইটী ঘটিকাযন্ত্র অনুপল, পল অথবা মিনিট সেকেণ্ড ধরিলে সমভাবে চলে না। কিন্তু মোটামুটি

সময় নিরূপণের বাধা দেয় না। বন্দস্থানে দুই চার সেকেণ্ড আগে কিম্বা পরে উপস্থিত হইলে কর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হয় না। এ স্থলে ব্যবহারিক সত্য, অর্থাৎ সময়নিরূপণ মোটামুটি করাই ক্রিয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু, যদি সময় নিরূপণ উদ্দেশ্য এই হয় যে, মহাসমুদ্রে বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া দেশদেশান্তরে যাওয়া, এবং কোন্ বিশেষ দিনে পৃথিবীর কোন স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছি তাহাই নিরূপণ করা হয়, তাহা হইলে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা এই স্থান নিরূপণ করিব, তাহার একটী প্রধান অঙ্গ হইতেছে, ঘটিকাযন্ত্রে তদানীন্তন সময় সূচনা। তদুদ্দেশ্যে কিন্তু আমরা সচরাচর যে ঘটিকাযন্ত্র ব্যবহার করি, তাহা সর্ব্বৈব অনুপযুক্ত। সেই গণনার জন্য বিশিষ্ট কাল-মান-যন্ত্র (chronometer), যাহার দুই সেকেণ্ড ভুল হইলে, হয় ত পাঁচ মাইলের স্থানের (ব্যতিক্রম) ঘটিতে পারে, সেই প্রকার যন্ত্রই, উদ্দেশ্য অনুসারে, প্রযুজ্য।

আর একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক্। বাটী হইতে শিবাদহ ষ্টেষণে, ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য। গাড়ীর ভাড়া মাইল হিসাবে দিতে হইবে। মোটামুটি আমার বাড়ী হইতে শিবাদহ ষ্টেসন প্রায় দুই মাইল। কিন্তু উদ্দেশ্য অনুসারে, সেই দুই মাইল, মোটামুটি, দুই মাইলের দশ বিশ হাত কমও হইতে পারে অধিকও হইতে পারে। উদ্দেশ্য অনুসারে এই ন্যূনাধিক্য বিচার করা অনাবশ্যক। কিন্তু, যদি উদ্দেশ্য, স্থাপত্য-মান শাস্ত্রের (Trigonometry) দ্বারা কোন দূরত্ব পরিমাণ করা, হয় তাহা হইলে, এক ইঞ্চির তফাৎ হইলেও উদ্দেশ্য প্রকৃতভাবে সফল হয় না। অতএব দেখা গেল, যে উদ্দেশ্যে দূরত্বের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে, সেই উদ্দেশ্য অনুসারে দূরত্বের বিচার করা প্রয়োজন।

আরও একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। আমরা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি, ঘটনামাত্রেরই একটা কারণ আছে। যখন একথা বলি, তখনও আমাদের তদানীন্তন ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের জন্য ঐ প্রকার কথাটী ব্যবহার করি। একটি লোক খানিকটা বারুদে অগ্নি-প্রদান করিল। অগ্নিপ্রদান মাত্র বারুদ শব্দ-সহকারে প্রজ্জ্বলিত হইল এবং নিকটস্থ একটী বালককে ঝল্সাইয়া দিল। এখানে সচরাচর কারণ নির্দ্দেশ জন্য, যে ব্যক্তি অগ্নি দান করিয়াছে, তাহাকেই, আমরা ছেলেটির দুর্ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, শাস্তির ব্যবস্থা করি। একটু ভাবিয়া দেখিলে, আমরা কিন্তু স্পষ্টঃ বুঝিতে পারি, অগ্নিদানকে প্রকৃত কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। যদি বারুদ ভিজা থাকে, অগ্নি প্রয়োগেও তাহা শব্দ সহকারে সহসা জ্বলিয়া উঠে না। বারুদের দাহিকা-শক্তির কারণ কি? সেই কারণ বিচার করিতে গেলে রসায়ন শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তাহাতে কি কি দ্রব্য আছে তাহার বিচার ও ঐ দ্রব্যের কি জন্য কি পরিণতি হয় তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু অগ্নি-দাতাকে শাস্তি দিবার জন্য এই সকল গবেষণার কোন প্রয়োজন হয় না এবং আমরা করি ও না। অতএব সিদ্ধান্ত এই হইল, আমাদের পারিবারিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কোন বিষয়ে কোন প্রকার নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্য হইলে, সেই উদ্দেশ্য অনুসারে, কোন্ বিষয়ে কি ব্যবহারিক সত্য আছে, তাহা আমরা বিচার করি। ততোধিক বিচার করিবার প্রয়োজন না থাকায়, করি না। ব্যবহারিক সত্য মাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা ক্রিয়া ও ব্যবহার সাধন করি।

প্রকৃত নিগূঢ় সত্যের বিচার অপ্রয়োজন। এই ভাবেই আমরা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি।

এখন দেখা যাউক, পারমার্থিক সত্য কি প্রকার এবং তাহার সত্তা কি ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। পারমার্থিক সত্য কি ? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, সে সত্য দেশতঃ, কালতঃ, বস্তুতঃ বিভিন্ন নহে। সে সত্য চিরন্তন সত্য। ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান সময়ে সে একই প্রকার নিত্য। সে সত্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বলোকে একই সনাতন সত্য। সে সত্য অক্ষুণ্ণ, সে সত্য অন্য কোন বস্তুর দ্বারা প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

এই বিষয়ের আরো কিছু আলোচনা করা যাক্। প্রথমতঃ আমাদের শরীরের কোন পারমার্থিক সত্ত্বা আছে কি ? সে শরীর পরিবর্ত্তনশীল, পরিণামশীল, তাহার উপচয়, অপচয় আছে ; তাহার জন্মে আবির্ভাব, মৃত্যুতে তিরোভাব ; সে শরীর কখনও শিশু-শরীর, কখনও বালক শরীর, কখনও যুবক-শরীর, কখনও প্রৌঢ় শরীর, কখনও বৃদ্ধ-শরীর ; এই শরীরের অবশ্য ব্যবহারিক সত্ত্বা আছে ইহা কিন্তু পারমার্থিক সত্ত্বা নহে। এই শরীর যে উপাদানে গঠিত, সে উপাদান পাঁচ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তিত হইয়া, পুষ্টিকর বস্তু গ্রহণ দ্বারা, সেই প্রকারের কিন্তু অন্য উপাদানের দ্বারা গঠিত হইয়া, প্রতীয়মান হয়। এই স্থলে বক্তব্য, শরীর বিষয়ে বিচার করিতে হইলে, কেবল তাহার ব্যবহারিক সত্ত্বা বিচারের অবসর আছে মাত্র। এই জন্যই ভগবান ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

আরো সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহ-কার বলিয়াছেন, যে সকল বস্তু আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করি, তাহারই ব্যবহারিক সত্ত্বা, অথবা ব্যবহারিক ভাব আছে, সে সকল বস্তুর আবির্ভাব এবং তিরোভাব আছে, সে সকল বস্তু ক্ষণভঙ্গুর ও ক্ষণবিধ্বংসী, তাহার ক্ষণে ক্ষণে পরিণতি হইতেছে ; সেই সকল বস্তু দেশতঃ, কালতঃ এবং বস্তুতঃ বিভিন্ন ; তাহারা ব্যবহারিক সত্ত্বার অধিকার ভুক্ত এবং ব্যবহারিক সত্তার বিষয়। আর, যে চিরন্তন বস্তুতে, এই ব্যবহারিক সত্ত্বার কোন ধর্ম্ম পরিলক্ষিত হয় না,—যে সত্ত্বা দেশতঃ কালতঃ বস্তুতঃ বিভিন্ন নয়,—সেই সত্ত্বাই পারমার্থিক সত্ত্বা। তিনি বলিয়াছেন,—সত্ত্বঃ অমীভাবাঃ অর্থাৎ, ব্যবহারিক সত্ত্বার বিষয়। তদ্ভাবঃ—পারমার্থিক সত্ত্বা।

এই জগতে, এই সংসারে, এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে পারমার্থিক সত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি। এই জগতে যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান, সবই তো ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণবিদ্ধংসী, পরিণামশীল, পরিচ্ছিন্ন। এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে আমরা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতে পারি,—এই বস্তুটি পরিচ্ছিন্ন, নয়, ইহার পরিণতি নাই, ইহার আবির্ভাব তিরোভাব নাই, ইহা সনাতন বস্তু, চিরন্তন বস্তু—ইহার জন্ম নাই মৃত্যু নাই ; ইহা স্বপ্রকাশ ; ইহা পরতন্ত্র নয় ; ইহার স্বভাবের ব্যতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলিব, এই বস্তুটি—সম্বিদ্। আপনারা ক্ষমা করিলে, ইংরাজী ভাষায় ইহাকে

Being, Feeling, Blissful Consciousness বলা যায়। সংস্কৃত ভাষায়, সচ্চিদানন্দং চিদরূপম্। আর পঞ্চদশীকারের কথায়,

নো দেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদে স্বয়ম্প্রভা।

আমরা এখন এরূপ স্থানে উপনীত হইলাম যে, আমাদের দেহাত্মবাদের বিরোধী হইতে হইতেছে। এ বড় কঠিন সমস্যা। চিরজীবন ধন জন যৌবনের জন্য লালায়িত আছি। পুত্র কলত্র, বন্ধু বান্ধব লইয়া কখনও উৎফুল্ল হইতেছি, কখনও বা বিষণ্ণ হইতে হইতেছে। চিরকাল যে জগতের, যে সংসারের, সার্থকতা বরণ করিয়াছি, যে জাগতিক বস্তুকে আরাধ্য দেবতা করিয়া হৃদয়-মন্দিরে অর্চ্চনা করিয়াছি, সেই মন্দির ও সেই আরাধ্য দেবতাকে, হয়ত কেবলমাত্র ব্যবহারিক সত্য বলিয়া, তাহাকে ভাঙ্গিয়া, পুনরায় পারমার্থিক সত্যের অভিমুখে কি উপায়ে অগ্রসর হই? দ্বৈত ভাব, ইংরাজী কথায়, Dual Consciousness, Empirical Experience, যাহার রাজত্বে চিরকাল বাস করিয়াছি, যাহার শাসনে পরতন্ত্র আছি, তাহার শাসন অতিক্রম করিয়া কোথায় পৌঁছিলাম? যতক্ষণ শরীরধারী, যতক্ষণ মনোবুদ্ধি অহঙ্কার আছে, যতক্ষণ 'জ্ঞাতাজ্ঞেয়ং জ্ঞানং' ছাড়িয়া একপাও অগ্রসর হইতে পারি না, সে অবস্থায় কিরূপে উপনীত হই? এ বিষম সমস্যা। কঠিন হইলেও, বহুচিন্তার ফলে, সামান্য কিছু আরাধনায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আপনাদের নিকট কথঞ্চিত নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি। আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা বলিবার পূর্ব্বে কিন্তু আপনাদিগকে সতর্ক করা আমার কর্ত্তব্য। এই পারমার্থিক সত্তা 'স সম্বদা' বস্তু। স্বীয় অনুভূতির বিষয়। ইহার কথঞ্চিৎ নির্দ্দেশ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ইহা কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে, পন্থা দেখান ভিন্ন, আর বড় একটা কিছু করিতে পারেন না। তবে, আমার যতটুকু সামান্য অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে আছে, তাহাতে এই বলিতে পারি যে It is an Experimental Science। যথোচিত সাধনা করিলে, ইহার অকাট্য সত্য উপলব্ধি হইবে। সে সাধনা কি, পরে বলিব। কিন্তু এক্ষণে, যতদূর সম্ভব দেখা যাউক, বিচারে কি ফল পাওয়া যায়।

যে জগতের কথা বলিয়াছি, আমার পক্ষে, সেই জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি প্রমাণ আছে? আমি তো দেখিতেছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার, তাহার অস্তিত্ব জ্ঞানের উপলব্ধি হইতেছে, ততক্ষণই আমি জগত আছে, এ কথা বলি। The universe exists for me because I am conscious of it, আমি যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখন ত জগতের কোন অস্তিত্ব আমার পক্ষে নাই। কিন্তু, যে ব্যক্তি জাগ্রত, তাহার পক্ষে জগত প্রতীয়মান। কেহ যখন মূর্চ্ছিত হয়, তখন তাহার মূর্চ্ছিতাবস্থায় তাহার পক্ষে জগত থাকে না, আর সকলের পক্ষে কিন্তু প্রতীয়মান। অতএব, জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান, সেই ব্যক্তিগত জ্ঞানই জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একমাত্র প্রমাণ। আমি জ্ঞান কথাটা ব্যবহার করিয়াছি। ইহা দ্বারা কিন্তু আমার মনোগতভাব প্রকৃতরূপে প্রকটিত হইতেছে না। পরে, আমি সম্বিদ্, চিৎশক্তি অথবা Self-consciousness এই কথা ব্যবহার করিতে চাই। এখন একটী প্রশ্ন হইতে পারে এই সম্বিদ্, এই চিৎশক্তি, এই

Self-consciousness কোথা হইতে আসিল? কে প্রদান করিল? কি উপায়ে তাহাকে পাইলাম? এ সম্বন্ধে বহুকাল হইতে অনেক দার্শনিকের নানা রকম গবেষণা হইয়া গিয়াছে। সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা নাই। ফলতঃ, আমার মনে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বেদান্ত শাস্ত্র যাহা বলিয়াছে এবং তদধীন সাধনা-শাস্ত্র যাহা নিরূপিত করিয়াছে, তাহাই গ্রাহ্য। এই সম্বিদের আবির্ভাব, তিরোভাব নাই, ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, , ইহা স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রকাশ চিরন্তনের অপরিণামী বস্তু, এক সূর্য্য কিরণে যে প্রকার সকল বস্তুর বিকাশ হয়, এই সম্বিদ, এই চিৎশক্তিও সেই প্রকার সকল বস্তুজগতের বিকাশক; ঐ যে সূর্য্য বলিয়াছি, তাহারও বিকাশক। সেই জন্যই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন—

নো দেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদে স্বয়ম্প্রভা।

এখন এ সম্বন্ধে অনেকে তর্ক উপস্থিত করিতে পারেন, যদি এই সম্বিদ একমাত্র সৎবস্তু হয়,—যদি ইহাই একমাত্র পারমার্থিক সত্য হয়,—যদি ইহারই একমাত্র পারমার্থিক সত্বা থাকে এবং অপর কোন জাগতিক বস্তুরই, ব্যবহারিক সত্বা ভিন্ন, পারমার্থিক সত্বা না থাকে, তাহা হইলে, বহু-নাম রূপ-সঙ্কুল জগৎ দ্বৈতের আধার হইয়া,—বহুত্বের আধার হইয়া,—কি প্রকারে বিকাশ পাইল? এবং এই বহুত্বেরই বা কারণ কি? যদি একত্বই পারমার্থিক সত্তা হয়, তাহা হইলে বহুত্ব-মূলক জগৎ কি প্রকারে প্রকটিত হইল? আর আমাদের সচরাচর সেই বহুত্ব জ্ঞানেরই বা কি কারণ? দোষ গ্রহণ না করিলে, এই ভাবটা ইংরাজী ভাষায়ও আপনাদিগের নিকট আমার বক্তব্য। If the Absolute, if the absolute consciousness, if the being feeling blissful consciousness, if the *Samhit*, if the *Chit-sakti* is the sole ultimate reality, how do you explain the manifoldness of the Universe, of nature, with its Dual Consciousness, empirical experience? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সমস্যা বড় জটিল। বিচার করিয়া আরো একটু দেখা যাক্। আমি যে বাহ্যজগতের অস্তিত্ব গ্রহণ করিতেছি, বাহ্যজগত যে আমার সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে, সে উপলব্ধি আমারই। সেই জগৎ আমার মনোবুদ্ধি অহঙ্কারের সহিত মনোরাজ্যে বিকশিত হইতেছে। তবে, আমার ব্যবহারিক উদ্দেশ্যের জন্য, তাহাকে আমা হইতে ভিন্ন বাহ্যবস্তু হিসাবে, দেখিতেছি। কিন্তু, সে আবার মনোরাজ্যের আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার বাহ্য নাম রূপ গ্রহণ করিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ইংরাজীতে বলিতে গেলে—The consciousness of the externality of the Universe is, after all, a mental state of the perceiver. আরো একটু অগ্রসর হই। আমার কাছে, জগত এবং জাগতিক বস্তু যে ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে, আমার বন্ধু হীরেন্দ্রবাবুর কাছে, ঠিক সেইভাবে প্রতীয়মান হইতেছে না। আমার একটী নবমবর্ষীয় বালক, তাহার নিকট এই জগত, আমার মনে যে প্রকার প্রকটিত হইতেছে, তাহা হইতেছে না। আমার বাড়ীর সহিস, সে জগতকে অন্য ভাবে দেখিতেছে। আমার বাড়ীতে একটী বিড়াল আছে, তাহার কাছে জগৎ অন্যভাবে প্রকাশ পাইতেছে। আমার বাড়ীর কীটপতঙ্গের জগত,

আমার জগত হইতে, সম্পূর্ণ না হউক, বহু অংশে ভিন্ন প্রকারে প্রকটিত হইতেছে। বলাবাহুল্য যে, প্রত্যেক জ্ঞাতার জগৎ তাঁহারই জগত, অন্য কাহারও নহে। ইংরাজী কথায়—The Universe as it appears, never appears the same even to two observers, with the result that there are as many universes as there are perceivers। অতএব জগতের যত জ্ঞাতা আছে, প্রত্যেক জ্ঞাতার বিভিন্ন জগৎ। এই জগত,—যাহার অর্চনা আজীবন করিতেছি,—সে কি প্রকারে সৎ বস্তু হইল? সত্য যে বস্তু, সে ত সকলের পক্ষেই সমভাবে প্রতীয়মান হইবে। অতএব, জগতের যখন পারমার্থিক সত্ত্বা নাই, যখন তৎসম্বন্ধে যে সম্বিদ্ তাহার একমাত্র কারণ, তখন সে সম্বিদ্ জাগতিক ক্রিয়ার কার্য্য (effect) কখনই হইতে পারে না। কিন্তু, সম্বিদ্ Self Consciousness যদিও জগৎকে নানারূপে প্রতীয়মান করিতেছে, কিন্তু তাহার অস্তিত্বের জ্ঞান (Consciousness of its existance—that is, the self-consciousness with regard to it, is the same for all) সকলের সাম্য।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় বিষয়টী বিশদ হইবে। মনে করুন, একটি নব-প্রসূতা যুবতী, তাঁহার নব-প্রসূত বালক তাঁহাকে একভাবে দেখিতেছে; তাঁহার স্বামী তাঁহাকে একভাবে দেখিতেছেন, তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে একভাবে দেখিতেছেন, তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী বন্ধুবর্গ তাঁহাকে একভাবে দেখিতেছেন, সন্ন্যাসী তাঁহাকে একভাবে দেখিতেছেন। কিন্তু সেই ভাব,—প্রত্যেক অন্তঃকরণের ভাব,—প্রত্যেকের সম্বিদের প্রভায় প্রত্যেক ভাব উদ্ভাসিত হইতেছে। সেই সম্বিদের স্বভাব এক, কিন্তু বাহ্যবস্তু যুবতী স্ত্রী প্রত্যেকের পক্ষে নানা ভাবে পরিদৃষ্টা হইতেছেন। আবার মনে করুন, মেঘ শূন্য সন্ধ্যায় রবি অস্তমিত হইতেছেন, পশ্চিম গগন নানা বর্ণে শোভা পাইতেছে। সেই সময়ে চিত্রকর গগনের শোভায় মুগ্ধ হইয়া, সেই শোভা চিত্রিত করিতেছেন। চোর রাত্রি আসিতেছে বলিয়া, তাহার চৌর্য্যকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বেদমাতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। স্বৈরিণী তাহার ব্যভিচারের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু, প্রত্যেকের পক্ষে সম্বিদ্—সূর্য্যাস্ত হইতেছে, সন্ধ্যা উপনীত। সে জ্ঞান সকলের পক্ষেই এক, কিন্তু ব্যবহারিক উদ্দেশ্য অনুসারে তাহাকে রূপান্তরে দেখিতেছে।

অদ্য এই প্রসঙ্গের আলোচনায় নিবৃত্ত হইতেছি। বারান্তরে এই প্রসঙ্গ উপলক্ষে আরো অনেক বক্তব্য রহিল।

শ্রীব্যোমকেশ শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী।

তিনটী স্বাধীন রাজ্য।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে কোচবেহার, ত্রিপুরা ও ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি উড়িষ্যার গড়জাত রাজ্যসমূহ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে বেহার ও উড়িষ্যাপ্রদেশ হওয়াতে গড়জাত সমূহ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। গড়জাতের মধ্যে ময়ূরভঞ্জ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উন্নত রাজ্য। এই রাজ্য মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জেলার সংলগ্ন। এজন্য উভয় দেশের লোকই এখানে দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ অধিবাসী কোল সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতি। নিম্নে ময়ূরভঞ্জের সহিত কোচবেহার ও ত্রিপুরার সম্বন্ধে একটী তালিকা প্রদান করিলাম। কোচবিহারে পতিত জমি নাই ও জঙ্গল পাহাড় নাই। ময়ূরভঞ্জ ও ত্রিপুরায় যথেষ্ট পর্ব্বত, জঙ্গল ও পতিত জমি আছে। এইজন্য উভয় রাজ্যই অতি দ্রুত বেগে উন্নতি লাভ করিবে। ত্রিপুরায়, এ পর্য্যন্ত কোনও খনিজ দ্রব্য আবিষ্কৃত হয় নাই। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের দ্বারা চেষ্টা করিলে পেট্রলিয়ম প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইতে পারে। ময়ূরভঞ্জে যে সমস্ত লোহার খনি বা পর্ব্বত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অনুমান হয় যে ১০ বৎসরের মধ্যেই খনিজদ্রব্যের আয় দশ লক্ষ টাকা হইবে। লৌহ ভিন্ন এখানে স্থানে স্থানে সোনা পাওয়া যায় এবং আরো অনুসন্ধান চলিতেছে। এতদ্ভিন্ন অভ্রও অল্প পরিমাণে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। অনেক যায়গায় পটষ্টোন বা থালা বাটি প্রস্তুতের পাথর পাওয়া যায় এতদ্ভিন্ন এখানে কেওলিন বা সাদামাটি, হরিদ্রাবর্ণ ও লালবর্ণ গিরিমাটি ও চূণ প্রস্তুতের ঘুটিং প্রচুর পাওয়া যায়। অরণ্যে উৎকৃষ্ট লাক্ষা ও তসরের গুটির চাষ হয়। ত্রিপুরায় চা বাগান হইতেছে। কিন্তু কোচবেহারে অন্য কোনওপ্রকারের আয়ের পথ নাই। প্রজার আয় বৃদ্ধি দ্বারা তাহার অংশ গ্রহণই একমাত্র ভরসা। উক্ত উভয় রাজ্য অপেক্ষা কোচবেহারে কৃষি দ্বারা অতি মূল্যবান ফসল প্রস্তুত হয়। কোচবেহারের তামাক অতি উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে চুরুট প্রস্তুত জন্য বঙ্গদেশে রপ্তানি হইত, পাট ও আলু প্রচুর জন্মে কিন্তু ইক্ষু চাষের কোনও উন্নতি দেখা যায় না। ইক্ষুর চাষের কোনও বিস্তৃত চাষও সম্ভব নহে কারণ চাষের উপযুক্ত পতিত জমি নাই; কোচবেহারের অধিকাংশ প্রজা ভাল কৃষক ও অসভ্য জাতি অল্প সংখ্যক। চতুর্দ্দিকে রেলপথ হইয়া ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা হইয়াছে। ময়ূরভঞ্জেও রেলপথ হইতেছে। ত্রিপুরায় রেলপথ কম। বর্ত্তমানকালে রেলগাড়ী, গরুর-গাড়ীর ন্যায় হইবে ও মোটর জেপেলিন প্রভৃতি উন্নত শ্রেণীর মনে হইবে। রেলপথ প্রস্তুত করিতে গবর্ণমেন্টের অনুমতির আবশ্যক ও সে অনুমতি সহজে পাওয়া যায় না, এজন্য উচিত যে, সমস্ত রাজাই প্রচুর পরিমাণে মোটর, রাস্তা প্রস্তুত করেন ও সমস্ত ক্ষুদ্র নদী সেতু দ্বারা বদ্ধ করেন। মোটর লরি ও যাত্রী-মটর স্বচ্ছন্দে নানাদিকে যাইয়া ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবে। বর্ত্তমান সময়ে এই তিন দেশেরই রাজা অল্প বয়স্ক। তাঁহারা পৃথিবীর উন্নতির সময়ে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আশা হয়, যে সমস্ত দেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভারতীয় রাজ্যের অবশেষে উন্নতি হইবে। ময়ূরভঞ্জের রাজগণ সূর্য্যবংশধর

খ্যাত, ত্রিপুরার রাজগণ চন্দ্রবংশ এবং কোচরাজবংশীগণ আপনাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলেন। কোচবেহারের কুমার ভবেন্দ্রনারায়ণ ত্রিপুরার এক রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন। কোচবেহারের মৃত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ৺কেশবচন্দ্রের দুই কন্যা বিবাহ করেন ও ময়ূরভঞ্জের মৃত মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও দ্বিতীয় বারে উক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্যা বিবাহ করেন। আবার ত্রিপুরার এক রাজকুমার নেপালের এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। এইরূপে পরস্পরের কিঞ্চিৎ সম্পর্কও আছে। ময়ূরভঞ্জের রাজগণ রাজ্যের উন্নতির জন্য উড়িষ্যার অনেক ব্রাহ্মণকে গ্রাম ও জমি দান করিয়া রাজ্যের স্থানে স্থানে বাসস্থান করিয়া দিয়াছেন। ত্রিপুররাজ কল্যাণমাণিক্য খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যার যাজপুর বা জাহাজপুর হইতে বহু ব্রাহ্মণ লইয়া গিয়া শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলায় ও ত্রিপুরা রাজ্যে স্থাপন করেন। ইহাদেরই বংশধর চৈতন্যমহাপ্রভু। ইঁহার পিতামহ শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে বাস করেন ও চৈতন্যের নবদ্বীপে জন্ম হয়। তিনি বাঙ্গালা কথা জানিতেন না এবং পরে শ্রীক্ষেত্রে বাস করিয়া স্বর্গলাভ করেন। এদিকে কোচবেহার রাজগণ এই শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মণগণের কয়েকঘর কোচবেহারে বাস করান। আবার ত্রিপুরার রাজকুমার বসন্তমাণিক্য ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে কতককাল ছিলেন। ময়ূরভঞ্জের সদরের অধীন সরহিতা গ্রামে ইহার একখণ্ড প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। লিপির সময় ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ। ইনি ত্রিপুরার রাজা বিজয়মাণিক্যের পুত্র। বিজয়মাণিক্য ১৫৩৫ হইতে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্য প্রতি প্রাচীন, ইহারা ৫৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজত্ব করেন, ইহাদের বংশ বিবরণে প্রকাশ। কিন্তু ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একখানি তাম্রপট্টে ইহাদের রাজা ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আরও ৪ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। মোট খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে যে বর্ত্তমান রাজবংশ রাজত্ব করেন তাহার সন্দেহ নাই। ত্রিপুরার রাজগণ কলির প্রারম্ভ হইতে রাজত্ব করেন। যুয়াঙ্গ চুয়াঙ্গ ইঁহাদের নাম করেন নাই। সম্ভবতঃ ইহারা মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে রাজত্ব করেন। যদি ত্রিপুরার শক হইতে রাজত্ব গণনা করা যায়,— তাহা হইলে ৫৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজত্ব আরম্ভ হয়, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে এইটী বাঙ্গলা সন বলিয়াই বোধ হয়। ত্রিপুরার রাজগণের উপাধি মাণিক্য ও মুসলমান রাজগণের প্রদত্ত। কোচবেহারের বর্ত্তমান রাজবংশ ৪১১ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব আরম্ভ করেন সুতরাং এই রাজ্য বয়স হিসাবে সর্ব্ব কনিষ্ঠ। কোচবেহার আয়তনে ও অপর দুইটীর অপেক্ষা অল্প কিন্তু লোকসংখ্যা ময়ূরভঞ্জের অপেক্ষা অল্প, ত্রিপুরার অপেক্ষা বেশী। শিক্ষা হিসাবে, কোচবেহার, ত্রিপুরা ময়ূরভঞ্জ অপেক্ষা অনেক উন্নত। ময়ূরভঞ্জে প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয় ও ইহাই প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। কোচবেহার ও ময়ূরভঞ্জে ব্যবসা অধিকাংশই মারওয়ারিগণের হস্তে কিন্তু ত্রিপুরায় নহে। পূর্ব্ব বঙ্গে মারওয়ারি অনেক কম, ঢাকা জেলায় নাই বলিলেই চলে। এই তিন রাজ্যের সর্ব্ববিষয়ে তুলনা করা কিম্বা বেহারের বিস্তৃত ইতিহাস লেখা আমার উদ্দেশ্য নহে। সমস্ত বিষয়ের কিঞ্চিত আভাষ দেওয়ার ইচ্ছা। বর্ত্তমান সময়ে তিন রাজ্যেরই ক্ষমতা সমান। ত্রিপুরা কোনও রূপ কর প্রদান করেন না। ময়ূরভঞ্জ মাত্র ১০৬৭৲ কর দেন কিন্তু কোচ-

বেহারের কর অত্যন্ত অধিক। ময়ূরভঞ্জের জমীদারীর অল্প আয়, মাত্র ৭০ কি ৮০ হাজার টাকা। কিন্তু, ত্রিপুরার জমিদারী অতি বৃহৎ এবং প্রায় রাজ্যের সমান আয়, কোচবেহারের জমিদারীও বেশ বৃহৎ। কোচবেহারে একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ ও চারিটী উচ্চ ইংরাজী স্কুল আছে। ত্রিপুরায়ও চারিটী ইংরাজী স্কুল আছে কিন্তু ময়ূরভঞ্জে মাত্র একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুল আছে। আবকারী আয় দেশের অবনতির চিহ্ন। কিন্তু ষ্ট্যাম্প ও কোর্টফির আয় আর্থিক উন্নতির চিহ্ন। এই তিন রাজ্যেই ইন্‌কম ট্যাক্স আদায় হয় না। লোক সংখ্যার তুলনায় কোচবেহার অপেক্ষা ত্রিপুরায় স্কুল-শিক্ষা-প্রাপ্ত বালক বেশী। কোচবেহার এবং ময়ূরভঞ্জ রাজ্য মধ্যে ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত করিয়া লন। কোচবেহার ও ত্রিপুরায় ইলেক্ট্রিক লাইট আছে, কিন্তু ময়ূরভঞ্জে নাই। কোচবেহারের রাজগণের উপাধি ভূপ বাহাদুর। যুবরাজকে পূর্ব্বে বাকাচুয়া বলিত। ভুটান রাজ কোচবেহার রাজাকে পত্র দ্বারায় এইরূপ সম্বোধন করিতেন—"স্বস্তি প্রাতরুদীয়মান দিনমণি মণ্ডল নিজ ভুজবল প্রতাপ তাপিত শত্রু সমূহ পূজিতাখিল বেহারেশ্বর শ্রী শ্রী মহারাজা জিউ বিষম সমর পঞ্চাননেষু।" রাজবংশীয় অন্যান্য লোককে কুমার বলে, এখন প্রিন্স। রাজার পিতামহীদিগের মধ্যে প্রধানা মহিষীকে জ্যাঙ্গর আই দেবতী ও দ্বিতীয়াকে বড় আই দেবতী কহে। রাজার প্রথমা স্ত্রী পাটরাণী, দ্বিতীয়া দেও আই দেবতী ও তৃতীয়া মধ্যম আই ঘবণী। ময়ূরভঞ্জের রাজারা ভঞ্জ সিংহ দেও। যুবরাজকে টীকায়েত বলে, দ্বিতীয় ছোট রায়, তৃতীয় রাউত রায়। রাজা মহিষী পাট সামন্ত ও রাজ-কন্যা জমা সামন্ত। রাজবংশের অন্যান্য পুত্র, লাল বা লালু ও কন্যাগণ মণি। ত্রিপুরার রাজার উপাধি বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত দেব বর্ম্মন মাণিক্য বাহাদুর"। যুবরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত দেব বর্ম্মন যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর। অপরাপর, ঠাকুর নামধেয়। এই রাজ্যত্রয়ের তুলনা মূলক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বিষয়	কোচবেহার	ময়ূরভঞ্জ	ত্রিপুরা
১ পরিমাণ-ফল	১৩০৭	৪২৪৩	৪০৮৬
২ লোক-সংখ্যা	৫৬১৯৭৪	৭২২২০০	১৭০৩২৫
৩ মোট আয়	২৬৫০০০০	২২ লক্ষ	২০ লক্ষ
৪ বন-বিভাগের আয়	০	৯ লক্ষ	৪ লক্ষ
৫ জমিদারীর আয়	৫ লক্ষ	৭৫ হাজার	৯ লক্ষ
৬ পুলিশসংখ্যা	৩০০	৩৭০	৩৪২
৭ সৈন্য-সংখ্যা	০	০	২৬৭
৮ শিক্ষা-প্রাপ্ত বালক-বালিকা	১৫০০০	১০০০০	৬০০০
৯ ডিস্‌পেন্সরী	১০	৮	১৬
১০ স্যালুট তোপ	১৩	৯	১৩
১১ আবকারী আয়	১৪০০০০	১২০০০০	২৪০০০
১২ কোর্ট-ফি ও ষ্ট্যাম্প আয়	১৮৫০০০	৪৫০০০	৬৫০০০
১৩ রাজ্যের বয়ঃক্রম	৪১১ বৎসর	১৩২৩ বৎসর	১৩৩৩বৎসর

ভারতবর্ষের করদ ও মিত্র রাজগণকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট দুই প্রকারে উপদেশ দিয়া

থাকেন, গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্ট দ্বারা ও রেসিডেণ্ট দ্বারা। অনেকগুলি রাজ্য একত্রে এজেণ্টগণের অধীন থাকে। যেমন, উড়িষ্যার রাজ্য-সমূহ। রেসিডেণ্ট অনেক রাজ্যে আছেন। বঙ্গ-দেশে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমান সময়ে রেসিডেণ্ট আছেন। কোচবেহারে এ দুই প্রকারের এক প্রকারও নাই। কোচবেহারে স্বর্গীয় মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সময় হইতে একজন গবর্ণমেণ্টের পেনশন প্রাপ্ত অথবা ধার দেওয়া সিবিলিয়ান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রূপে রাজ্য শাসন করেন। অন্য কোনও রেসিডেণ্ট নাই। যদি এই প্রথায় কার্য্য চালাইলে অন্যত্র এই প্রথা অবলম্বন আবশ্যক।

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ বসু।

মহাভারত মঞ্জরী।

সভাপর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায় — ইন্দ্রপ্রস্থ নির্ম্মাণ।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি সকলেই এখন জানিতে পারিয়াছেন, পাণ্ডবেরা জতুগৃহ-দাহে দগ্ধ হন নাই, উপরন্তু দ্রুপদরাজ-নন্দিনীকে বিবাহ করিয়া প্রবলের আশ্রয় পাইয়াছেন। তাই তাঁহারা আবার শত্রুনাশের সহজ ও নিরাপদ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। দুষ্ট দুর্য্যোধন আবার বন্ধুভাব দেখাইয়া অতীতের অভিনয় করিতে চাহিলেন। কর্ণ বলিলেন,—"পাণ্ডবেরা যখন ছোট ছিল, তখন তুমি সকলই করিয়া দেখিয়াছ, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। এমন তাহারা বড় হইয়াছে। "এখন প্রকাশ্য ভাবে আক্রমণ করিয়া নিহত করা ভিন্ন আর উপায় নাই।" রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "তোমাদের যে মত, আমারও সেই মত। তবে বিদুর পাছে আমার মনের ভাব জানিতে পারে, এইজন্য সময় সময় পাণ্ডব পক্ষে দুই এক কথা বলিয়া থাকি।" (১)

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভা করিয়া বসিয়াছেন। ভীষ্মদেব তাঁহাকে বলিলেন, "রাজন্, পাণ্ডবদিগকে অৰ্দ্ধেক রাজ্য দেওয়া উচিত। নতুবা কাহারও মঙ্গল হইবে না। আমার নিকট উভয় পক্ষই সমান। পরে দুর্য্যোধনের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "জতুগৃহদাহে তোমার ভয়ঙ্কর অযশ হইয়াছে"। এখন ধর্ম্মকার্য্য কর যে কীর্ত্তি থাকে।" অন্ধ-রাজ ভাবিলেন, ভীষ্মদেব তাঁহাকে একথা বলিলেন।

দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, "ন্যায় অনুসারে পরামর্শ দেওয়াই অমাত্যগণের উচিত। এজন্য বলিতেছি, ভীষ্মদেব যাহা বলিবেন, তাহা করাই আপনার উচিত।"

কর্ণ বলিলেন, "রাজেন্দ্র, ভীষ্মদেব ও আচার্য্য আপনার অন্নেই পুষ্ট। কিন্তু তাঁহারা আপনার যাহাতে ক্ষতি হয়, সতত এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন। তাঁহারা মুখে আপনার পক্ষপাতী, কার্য্যত পাণ্ডবগণের হিতৈষী।"

---

(১) আদিপর্ব্ব ২০২—১২।

তাহা শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, "কর্ণ, তোমার এরূপ বলা উচিত হয় নাই। তুমি পাণ্ডবগণের সতত হিংসা কর, কাযেই এই রূপ বলিলে। আমি সত্য কথা বলিতেছি, আমরা যাহা বলিলাম, তাহা না শুনিলে নিশ্চয়ই কৌরবগণ বিনষ্ট হইবে।"

তখন বিদুর দণ্ডায়মান হইয়া অতি তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন, "রাজন, ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্য অপেক্ষাও কি আর কেহ আপনার অধিক হিতৈষী? তাঁহাদের ন্যায় বুদ্ধিমান ও পুরুষসিংহ কে? তাঁহাদের মতে পাণ্ডবগণ অজেয়। বস্তুতঃ যাঁহাদিগের মধ্যে একদিকে পরাক্রম, অন্যদিকে দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও সত্য নিত্য প্রতিষ্ঠিত, কে তাঁহাদিগের অতিক্রম করিতে পারে? জতুগৃহদাহে আমাদের ভয়ঙ্কর কলঙ্ক হইয়াছে। এখন তাহা দূর করুন।"

অন্ধরাজ ভাবিলেন, তবেত সকলেই পাণ্ডব পক্ষে, একা কর্ণ কি করিবেন? তখন তিনি মধুর স্বরে উত্তর করিলেন, 'বিদুর, তোমরা যাহা বলিলে, আমি তাহাই করিব। তুমি যাও, পাণ্ডবগণকে বহু ধন রত্ন ও অলঙ্কার দিয়া, সৎকার করিয়া, এখানে লইয়া আইস। আমার পরম সৌভাগ্য যে তাহারা আকস্মিক গৃহদাহে দগ্ধ হয় নাই।'

তাহা শুনিয়া বিদুর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখনই পাঞ্চাল নগরে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণকে রাজার পক্ষ হইতে বহু ধন রত্ন ও অলঙ্কার উপহার দিলেন। পরে দ্রুপদ, কৃষ্ণ ও বলরামের অনুমতি লইয়া পঞ্চ পাণ্ডব, কুন্তী ও দ্রৌপদীকে অতি সম্মান সৎকারে হস্তিনায় আসিলেন। সমুদয় প্রজারা তাঁহাদিগকে দেখিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "তোমাদিগকে অৰ্দ্ধরাজ্য দিলাম। এখন খাণ্ডব-প্রস্থে গিয়া বাস কর, যেন দুর্য্যোধনের সহিত আর বিবাদ না হয়।

খাণ্ডব-প্রস্থ যমুনা নদীতীরে এক মহাবন। পাণ্ডবেরা সেখানে গিয়া তাহা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ, বলরামের সাহায্যে তথায় এক মনোহর নগর নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্র সহস্র লোক প্রত্যহ কার্য্য করিতে লাগিল। প্রশস্ত রাজপথ, কত হর্ম্ম্যমালা, বিহার উদ্যান, চিত্রশালা, জলাশয় প্রভৃতি প্রস্তুত হইল। নগরী পরিখা ও প্রাচীর পরিবেষ্টিত হইল। পাণ্ডবেরা তথায় বহু অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্র স্থাপন করিলেন। (২) নানা দেশ হইতে বহু বণিক, শিল্পী ও অধিবাসী আনিয়া নগরীপূর্ণ করিলেন। এইরূপে সেই বিজন বন ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও অকাতর পরিশ্রমে শীঘ্রই এক মহানগরীতে পরিণত হইল। সেই খাণ্ডব-প্রস্থের নাম এখন অতি গৌরবের ইন্দ্রপ্রস্থ হইল। (৩) কত শতাব্দী হইল, ইন্দ্রপ্রস্থ অদৃশ্য হইয়াছে, শুধু ধূলায় পরিণত হইয়াছে, তথাপি প্রদর্শক পুরাতন দিল্লীর মধ্যস্থলে একস্থানকে সেই ইন্দ্রপ্রস্থ বলিয়া দেখাইয়া দিয়া আজও পর্য্যটকের প্রাণ আকুল করিয়া তুলে!

পাণ্ডবেরা এখন বহু দেশ জয় করিলেন, বাহুবলে শীঘ্রই এক বৃহৎ স্বরাজ্য স্থাপন করিলেন। তাহা সমুদয় পঞ্চ-নদ প্রদেশে বিস্তৃত হইল। তাহা তাঁহাদের অতি গৌরবের পৈত্রিক হস্তিনা-পুর রাজ্যকেও সর্ব্ববিষয়ে অতিক্রম করিল। এখন আর সে রাজ্যেরপ্রতি পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র লোভ রহিল না। তাঁহারা এই নূতন রাজ্যের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি সকল

(২) আদিপর্ব্ব ২০৭—৩৪,৩৫।　　　(৩) আদিপর্ব্ব ২০৭ অধ্যায়।

বিষয়েরই উন্নতি করিলেন। একমাত্র প্রজার কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্য-শাসন করিতেছিলেন। প্রজাগণ তাঁহাদের কীর্ত্তি-কথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাঁহার জীবনই ধন্য, যাঁহার যশোগাথায় দিক সকল মুখরিত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়। অর্জ্জুন-সুভদ্রা পরিণয়।

পঞ্চ পাণ্ডব ইন্দ্রপ্রস্থে এই নিয়ম করিয়াছেন যে, এক ভ্রাতা দ্রৌপদীর নিকট নির্জ্জনে থাকা সময়ে অন্য ভ্রাতা তথায় গমন করিবেন না; করিলে তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে। একদিন একদল দস্যু আসিয়া এক ব্রাহ্মণের গাভী হরণ করিতেছিল। ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে সংবাদ দিলেন। তখন অস্ত্রাগারে রাজা যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী ছিলেন। অর্জ্জুন অনন্যোপায় হইয়া তথায় গমন করিলেন এবং অগ্রজকে অভিবাদন করিয়া অস্ত্র শস্ত্র লইয়া নির্গত হইলেন। গোধন উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন। শেষে ভ্রাতৃগণের নিষেধ সত্ত্বেও সত্য পালনার্থ দ্বাদশ বর্ষের জন্য গমন করিলেন।

তিনি নানা তীর্থ-পর্য্যটন করিলেন। গঙ্গাদ্বারে গিয়া অনার্য্য নাগ-রাজের বিধবা-কন্যা উলুপীকে বিবাহ করিলেন। পূর্ব্বে এদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। (৪) পরে মণিপুরে গিয়া তথাকার রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইনিও অনার্য্য কন্যা। পূর্ব্বে সকল জাতিই সকল জাতির কন্যা বিবাহ করিত। (৫) অনন্তর তিনি পশ্চিম সমুদ্রে যে সকল তীর্থ ও দেশ আছে, তথায় ভ্রমণ করিয়া (৬) দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তখন রৈবতক পর্ব্বতে উৎসব হইতেছিল; কত নরনারী তথায় অবাধে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সঙ্গে কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী, অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যময়ী সুভদ্রাও ছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। অমনি উভয়ে উভয়ের রূপে মুগ্ধ হইলেন। চারি চক্ষু এক হইল। বিনা তারে প্রাণের কথা প্রেরিত হইল। চতুর কৃষ্ণ তাহা ধরিয়া ফেলিলেন। কি উপায়ে মনোরথ পূর্ণ হইবে তাহাও প্রিয়সখাকে বলিয়া দিলেন।

অর্জ্জুন কৃষ্ণের রথে মৃগয়ার ব্যপদেশে দ্বারকা হইতে নির্গত হইলেন। সেই সময় সুভদ্রা রৈবতক পর্ব্বতের উৎসব দেখিয়া গৃহে আসিতেছিলেন। অর্জ্জুন সাভিলাষা (৭) সুভদ্রাকে পথে পাইয়া রথে তুলিয়া লইলেন, আর অমনি অতি দ্রুতবেগে স্বদেশ অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

তখনই সে সংবাদ দ্বারকায় পঁহুছিল। অমনি যদুবংশ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। তাহা দেখিয়া বলরাম বলিলেন, "তোমরা ত যুদ্ধ করিতে চলিয়াছ, কিন্তু কৃষ্ণ যে নীরবে বসিয়া আছেন! অগ্রে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা কর।" তখন সকলে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা

৪। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'বিধবা-বিবাহ' দ্রষ্টব্য।

৫। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'বিবাহ' দ্রষ্টব্য।

৬। আদিপর্ব্ব ২১৮—২

৭। মূলে কামিনী শব্দ আছে। বর্দ্ধমান রাজবাটীর অনুবাদে তৎপরিবর্ত্তে সাভিলাষা লিখিত আছে। আদিপর্ব্ব ২—১২৫।

করিলেন। তিনি বলিলেন, "অর্জ্জুন জানেন, আমরা লোভী নহি, এজন্য তিনি অর্থ দিয়া বিবাহ করিতে চেষ্টা করেন নাই। কন্যাদানও ক্ষত্রিয়গণের প্রশস্ত নহে। স্বয়ম্বরেও কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন। এই সকল বিবেচনা করিয়াই হয় ত তিনি কন্যা হরণ করিয়াছেন। তাহাতে আমাদের অপমান হয় নাই, বরং সম্মান-বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি একে ত রাজপুত্র, তাহাতে মহাবীর, ক্ষত্রিয় কুলের অলঙ্কার। সর্ব্বাংশেই সুভদ্রার অনুরূপ পাত্র। আমার মত, তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়া উভয়ের বিবাহ দাও।" কৃষ্ণের মত কে উপেক্ষা করিবে? তখন তাহাই হইল। এইরূপে অর্জ্জুন আপন মাতুল কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। (৮) পরে প্রতিজ্ঞাত দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে, সুভদ্রাকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। সুভদ্রা দ্রৌপদীর উপর হাসিভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, আর বলিলেন, "আমি তোমার দাসী হইয়া আসিয়াছি।" হয় ত ইহাতেও কৃষ্ণ-মন্ত্র ছিল।

দ্রৌপদী হাসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন, আর আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন।"

কৃষ্ণ বলরাম বহু ধনরত্ন যৌতুক লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলেন। তাঁহাদিগকে পাইয়া পাণ্ডবগণের আনন্দের সীমা রহিল না। কৃষ্ণ তথায় থাকিলেন, বলরাম স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকেও বহু ধনরত্ন প্রীতিউপহার প্রদান করিলেন।

এই শুভ সম্মিলনে সকলেই যারপর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। কেবল একজন অর্জ্জুনের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রহিলেন। অর্জ্জুনও ঝড়ের বেগ দেখিয়া অন্যান্য অপরাধের কথা আর তুলিলেন না। যুদ্ধটা অনেক দিন খুব চলিল, শেষে অর্জ্জুন হাত পায় ধরিয়া সন্ধি করিলেন। হাতপায় ধরার প্রথাটা এদেশে অতি প্রাচীন। পুরাতত্ত্ববিদগণ আলোচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘাডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া (৯)॥

তৃতীয় অধ্যায়—খাণ্ডব-দাহ।

আমরা মহাভারতের মনোহর উদ্যানে বিচরণ করিতে করিতে এখন এক ভীষণ বন ও কণ্টকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। তাহার মধ্যে স্থিত উচ্চবৃক্ষের অনৈসর্গিক পারিজাত প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া বেল, যুঁই প্রভৃতি প্রকৃতির যে সুন্দর ফুল আশে পাশে ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহাই তুলিতেছি।

৮। আদিপর্ব্ব ২১৯—১৮।

৯। পাঁঠার সহিত পাঁঠার যুদ্ধে, ঋষির শ্রাদ্ধে, প্রভাতের মেঘ-আড়ম্বরে এবং পতিপত্নীর কলহে আরম্ভটা খুব ধুমধামে হয় সত্য কিন্তু শেষে কার্য্যটা খুব সামান্যই হয়। পাঁঠার সহিত পাঁঠার যুদ্ধে আক্রমণের সময় খুব বিক্রমদেখায় কিন্তু এমন ভাবে আঘাত করে যে কেহই দুঃখ না পায়। ঋষিদের শ্রাদ্ধে বহু ঋষির নিমন্ত্রণ করা হয় কিন্তু সকলে আসিলে প্রত্যেককে একএকটী হরিতকী মাত্র দেওয়া হয়। প্রভাতে খুব মেঘ হইলেও বৃষ্টি সামান্য হয়। আর দম্পতির কলহ, ইহা আমি কেন? সকলেই জানেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খাণ্ডব এক মহাবন। তাহার কিয়দংশ পরিষ্কৃত ও তথায় ইন্দ্রপ্রস্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট পূর্ব্ববৎ মহাবনই ছিল। তথায় সর্ব্বপ্রকারের অসংখ্য বন্য পশু বাস করিত। একদিন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যমুনাতীরে বসিয়া আছেন, এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ তাঁহাদের নিকট আসিয়া এই বন দগ্ধ করিতে অনুরোধ করিলেন। (১০) তাঁহারা সম্মত হইলেন। মহাভারতে আছে, পূর্ব্বেও অনেকে এই বন দগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু অতিবৃষ্টি বশতঃ কৃতকার্য্য হয় নাই (১১)। আর এক স্থানে আছে, দেশের হিতসাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এই খাণ্ডব-বন দগ্ধ করিয়াছিলেন। (১২) তবেই মনে হয়, এই মহাবনের অসংখ্য বন্যপশু রজনীতে নির্গত হইয়া চতুষ্পার্শ্বের শস্যক্ষেত্র সকল নষ্ট করিত, গবাদি বিনষ্ট করিত, অধিবাসীগণের প্রাণ হরণ ও বহু ক্ষতি করিত। তাহা নিবারণ করিতে পারিলে, দেশের হিত সাধিত হইত। আবার এই বনপ্রদেশ পরিষ্কৃত হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইলেও দেশের মঙ্গল হইত। আবার ইন্দ্রপ্রস্থের ন্যায় রাজধানীর নিকটে এতবড় বন থাকাও বাঞ্ছনীয় নহে। সম্ভবত, এই সকল কারণেই এই বনদাহের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা হইয়াছিল। যাঁহারা কখনও পশ্চিম প্রদেশে মহাবন দগ্ধ করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, গ্রীষ্মকালে যখন প্রবল বায়ু পশ্চিম দিক হইতে ঝটিকার ন্যায় বহিতে থাকে, এক সেই সময় ভিন্ন মহাবন আর কখনও দগ্ধ করা যায় না। আবার সেই সময় সতত বৃষ্টি হয়। এইজন্য মহাবন দগ্ধ করা অতিশয় কঠিন কার্য্য।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দগ্ধ করিতে সম্মত হইলে, সেই ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকে গাণ্ডীব নামক এক অতুলনীয় অতি বৃহৎ ধনু ও দুইটী অতি বৃহৎ তূণ ও রথ এবং কৃষ্ণকে গদা ও চক্র প্রদান করিলেন। এই চক্র নিক্ষিপ্ত হইলে, বৃত্তাকারে গমন করিয়া শত্রু সংহার করিয়া নিক্ষেপকের হস্তে পুনরায় ফিরিয়া আসিত। (১৩)

এই মহাবনের একদিকে অগ্নি দিলে, অন্য দিক দিয়া অসংখ্য বন্য পশু পলায়ন করিত ও উদ্দেশ্য পণ্ড হইত। এই জন্যই বোধ হয়, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এই বিস্তৃত বনের চতুষ্পার্শ্বে সমকালে ভীষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন। তথাপি কত পশু পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অতি দ্রুতবেগে সেই বনের চতুষ্পার্শ্বে রথ পরিচালন করিতে লাগিলেন, আর পলায়ন-পর পশুদিগকে নিহত করিয়া, সেই অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই বন্য-পশুগণ পলায়ন সময়ে অর্দ্ধদগ্ধ হইলে, পরে মরিয়া, পচিয়া দুর্গন্ধ বিস্তার করিত। নিকটবর্ত্তী

১০। আদিপর্ব্ব ২২৮—৩০ লাং ৩৩।

১১। আদিপর্ব্ব ২২৩—৮।৯।

১২। আদিপর্ব্ব ২৩৪—৫।

১৩। আদিপর্ব্ব ২২৫—২৭। অনুমাণ ২৮।২৯ বৎসর হইল মৃত বন্ধুবর রেভারেণ্ড পঞ্চানন বিশ্বাস আমা-দিগকে বলেন যে তিনি অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে গিয়াছিলেন। তথাকার আদিম অসভ্য অধিবাসীরা এখনও এরূপ চক্র ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহা নিক্ষেপের কৌশলে বৃত্তাকারে গমন করিয়া শত্রুর মস্তক ছেদন করিয়া নিক্ষেপকের হস্তে ফিরিয়া আইসে। তিনি তথা হইতে এরূপ কয়েক খানি অস্ত্র আনিয়াছিলেন কিন্তু সাহেবেরা তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়াছিলেন।

গ্রামের জলবায়ু দূষিত করিত। গ্রীষ্মকালে মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত বৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বনের সর্ব্বত্র এমন ভীষণ অনল প্রজ্জ্বলিত করিলেন যে কিছুতেই তাহা নির্ব্বাপিত হইল না। এইরূপে তাঁহারা পঞ্চদশ দিবস ধরিয়া দিন ও রাত্রি, রাত্রি ও দিন অবিরাম ও অকাতরে পরিশ্রম করিয়া এই মহাবন দগ্ধ করিলেন। এই দেশোপকারে সকলে তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিল। দেশোপকারে যে যশ হয়, তাহা আর কিছুতেই হয় না।

ক্রমশঃ

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

মহাজাগরণ।

আজ্‌কে শুভ শঙ্খরবে এমন ক'রে ডাক্‌লো কে?
আকুলকরা, উদারস্বরে পড়্‌লো সাড়া নাকলোকে!
স্বাধীনতার বার্ত্তা এল, মর্ত্ত্যে সুরনিম্নগা,
অবাধগতি, অযুতভীম নক্র-মীন-পন্নগা।
জহ্নু তারে শুষল মিছা মন্ত্রভরে, নিঃশেষে,
প্রতীপ হ'ল ঐরাবত, পলকে গেল ঐ ভেসে।
দলিয়ে বাধা, টলিয়ে গিরি, গলিয়ে গুরু হিমশিলা,
সরস করি উষর মরু, করিয়া তরুর মূল ঢিলা,
ধরিত্রীর আঁচলে করি সবুজ জরি-শিল্পকাজ,
শান্তিশুভ শক্তিময়ী, মুক্তিরূপা নাম্‌ল আজ।
শুষ্ক শত শীর্ণখালে হঠাৎ আজি ডাক্‌ল বান।
অসাড়, জড় ভস্মরাশে হঠাৎ আজি জাগ্‌ল প্রাণ।
স্পন্দ এল হিমশরীরে, অন্ধআঁখি রূপ দেখে,
অধীর হ'ল রক্তধারা তীব্র চেতন মদ চেখে।
উঠ্‌ল কোটিকণ্ঠে আজি জয়ধ্বনি দেশমাতার,
অগ্নিগিরির ফুল্‌কি লেগে উঠ্‌বে জেগে চীন্ তাতার।
জাগ্‌ল ওরে, জাগ্‌ল এবার নয়ন মেলি নির্নিমেষ,
বক্তিয়ারের আমল থেকে সুপ্তিহত বাংলা দেশ।

বক্তিয়ারের আমল থেকে রক্তআঁখির ক্রীতদাস
আজ্‌কে সবে কলরবে, উঠ্‌ল মেতে, কি উল্লাস!
বল্লে সবে সমস্বরে সমুন্নত মস্তকে,—
"চরণ-সেবা-বৃত্তি থেকে রেহাই দিনু হস্তকে।

দাসদের ঐ সজ্জা প'রে লজ্জা ত আর ঢাক্‌বো না।
হোক্ না কেন রত্নে গড়া, শিকল পায়ে রাখ্‌বো না।
ডাইনে বাঁয়ে সেলাম-ঠোকা, জাত-গোলামের হীনপেশা
বিসর্জ্জিয়া কোকেন্ হেন সুদুর্জ্জয় এই নেশা।
মানুষ মোরা, অমর মোরা, কর্‌বো না ক মৃত্যুভয়।
আত্মা মোদের অজয়, মোদের চিত্ত কারো ভৃত্য নয়।
দেশের পাশ মুক্তি দিতে শক্তি যদি নাও থাকে,
নিজের মান রাখ্‌ব মোরা, রাখব স্বাধীন আপনাকে।
কর্‌বো না আর চাক্‌রী কারো, অন্ন যদি নাই জুটে।
মর্‌বো না আর অর্দ্ধশত আর্দালীদের পায় লুটে।
করবো স্বাধীন ব্যবসা কারুর মানবো না ক শাসন,
এখন যারা তুচ্ছ করে, তারাই দেবে উচ্চাসন।"

"মিঠা মোদের মাটি, মোদের মিঠার মাঝে ঘরকরা,
পুষ্পফলে মধু মোদের, কন্দমূলে শর্করা;
মোদের ইক্ষু-যষ্টিগুলি মিষ্টরসে টল্‌টলে,
হাজার ধারে তাল-খেজুরের অঙ্গে মিঠা জল গলে।
এই দেশেতে, কেমন পোড়া অদৃষ্টের এ শয়তানী,—
চায়ের সাথে খাবার চিনি যাভা থেকে আমদানী!
ঘুচাও এ কলঙ্ক, কর চিনির বড় কারখানা,
কিংবা গ্রামে গ্রামে বসাও ছোট কল হাজার খানা।"
"মস্তবড় কারখানা?।সে অনেক টাকার মামলা যে,
ছোট্ট কলে লাভ বেশী নেই, করিই বা তা কোন্ লাজে?"

"গোধনগুলি হচ্চে উজাড়, ছাগের আকার ষাঁড়গুলা,
গোশাল থেকে কিন্‌চে কসাই চাম্‌ড়া এবং হাড়গুলা।
ছটাকখানি দুধ মেলা ভার আটটা গরুর বাঁট ক'ষে,
মাথা কুটেও জুটছে না আর ঘৃতের ছিটা হাট চ'ষে।
শুকিয়ে গেল বৃদ্ধ, শিশু দুগ্ধাভাবে, ধুঁক্‌চে দেশ,
রুগ্ন-লোকের শুষ্ক উদর প্লীহায় শুধু ভর্‌চে বেশ
দশজনেতে চেষ্টা ক'রে দেশের এ হীন দিন ঘুচাও,
Breed কর সব আচ্ছা গরু, বাচ্ছাগুলোর প্রাণবাঁচাও,
স্নিগ্ধ কর দগ্ধ এ দেশ; দুগ্ধ-ঘৃত-ক্ষীর-ছানায়"—
"পারবো যদি না হয় কভু ঢুক্‌তে গোয়াল ঘরখানায়।"

"পার্শে-ইলিশ টিনে ভ'রে, একটা ভাল দিন দেখে,
চালান কর দেশ বিদেশে।"
"পাগল নাকি? কিন্‌বে কে?"
"দেশের পাটে, দেশের কুলি খাটিয়ে, যত Jute millএ
লুটচে টাকা বৈদেশিক বণিক্‌গুলা জোট মিলে"—
"চেষ্টা ক'রে মোরাও পারি করতে ছটো চটের কল;
কিন্তু তাদের চিন্‌বে কেটা, সিন্ধুমাঝে ঘটের জল!
পাটের কথা ভোলাই ভাল। পাটের চাষে কম ক্ষতি?
এর বদলে ধানের আবাদ কর্‌লে বেশী সঙ্গতি।"
"ধানের চাষই কর, গজাও একের স্থানে তিনটা শীষ্"
"রক্ষে কর, লক্ষ্মী করুন রিক্ত হবার সত্যাশীষ।
পারবো না ভাই পাঁকুই নিয়ে ভুগ্‌তে থালি পায় হেঁটে।"
"আড়ৎদারী?"
"তাও ত দেখি মাড়োয়ারীর একচেটে।"

"দোকান করা,"
"গ্রীষ্ম শীতে ভোর না হ'তে ঝাঁপ তুলে
মিনিট গোণা, অলক্ষিত খদ্দেরের বাপ তুলে,
সাঙ্গ ছটো শ্যালীর সঙ্গে গল্প, হাসি, মশকরা,
ড়-পাঁচজন বন্ধুকে বা তাসপাশাতে বশকরা,
চুলোয় গেল নভেল পড়া, কুলোয় না ক' ফুর্‌সতে,
Football বা Bioscopeএর খবর রাখা দূর হতে,
গন্তে ঘুরে, অস্তমিত দুপুর বেলা নাকডাকা,
আধ পয়সার হিসাব ক'ষে স্বপ্ন শুধু লাখ টাকা।
চাই না মোরা, বয়স ভোর এ কাঁচ্চা ভরির দামধরা,
ভদ্রলোকের চাম্‌ড়া নিয়ে দাম্‌ড়া গরুর কাম করা।"

বছর কত এম্‌নি ধারা চল্ল বহু জল্পনা।
পছন্দসই ব্যবসা বাছা, ঝক্কি বড় অল্প না।
কৃষির কাজ বে-ইজ্জতী, বাণিজ্যে না মন জমে,
মিস্ত্রী-মজুর হবার কথা ভাব্‌লেও যে প্রাণ দমে।
তাহোক্—তবু বঙ্গবাসী কল্লে পালন ঘোর শপথ,
নিলেন বেছে সবাই যে যার মনের মত স্বাধীন পথ—
নকুল মুখো উকিল হ'ল, উকিল হ'ল মাখন লাল,
উকিল হ'ল ফকির চাঁদ, আর উকিল হ'ল অখিল পাল,

উকিল হ'লেন নারাণ ভট্ট, হারাণ চট্টো, বীরেন বোস্,
উকিল হ'লেন অরুণ গুপ্ত, হিরণ দত্ত, কিরণ ঘোষ,
উকিল হ'লেন রমেশমৈত্র, টমাস মিত্র, এল্, বি, সেন,
সেখমহম্মদ, মুন্সীআমেদ, সৈয়দ্ হামীদ্, দিল্হুসেন।
আর বাকী সব রৈল যারা, ঢুকল Lawএর ক্লাস ঘরে,
উকিল হ'য়ে ঘুরবে আশা বেরিয়ে বি, এল, পাশ ক'রে।

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

সঙ্গণিকা।

শুভ নববর্ষে। যাঁহার অলঙ্ঘ্য বিধানে কালচক্র ঘুরিতেছে, যাঁহার অজস্র করুণায় "নব্য-ভারত," আটত্রিশ বৎসর নানা বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করিয়া আজ ঊনত্রিশ বর্ষে পদার্পণ করিল, সর্ব্বপ্রথমে সেই বিশ্বনিয়ন্তাকে স্মরণ করি; ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভরে প্রণাম করি। তাহার পর, ইহার গ্রাহক অনুগ্রাহক ও পাঠক সকলকে অভিবাদন করি। যাঁহার অঙ্কলে "নব্যভারতের" জন্ম, যাঁহার হৃদয়ঢালা ঐকান্তিক সেবায় "নব্যভারত" এতদিন সংসার পথে চলিতে পারিয়াছে,—যিনি ছিলেন ইহার প্রাণ, তাঁহার কথা মনে হইয়া, আজ হৃদয় মন ভারাক্রান্ত; অবসন্ন, উৎসাহ উদ্যম, নয়ন, অশ্রুসিক্ত। তাঁহার অবর্ত্তমানে, "নব্যভারত" কি ভাবে চলিবে, বর্দ্ধিত হইবে, সকলের কতদূর মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, এ জটিল প্রশ্নের সমাধান বিধাতাই করিতে পারেন। অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অনাথের নাথ সেই স্বয়ম্ভূ শ্রীহরির নির্দ্দেশেই আজ কত সহৃদয় মহাপ্রাণে নিঃস্বার্থ ভাবে "নব্যভারতের" অঙ্গ-পুষ্টি ও সৌষ্ঠব-বৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, অযাচিত, অপ্রত্যাশিত অনন্য সাধারণ এই সাহচর্য্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়া, কৃতজ্ঞতা-ভরে হৃদয় নত হইয়া পড়িয়াছে; গাঢ় অবসাদ-রজনীতে এই শুভ্র আশার আলো লাভ করিয়া প্রবোধিত হইতেছি।

"নব্যভারত" যে সেবাব্রত লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠকবর্গের স্নেহ-সিঞ্চনে তাহা উদ্‌যাপনের অশেষ সহায়তা হইয়াছে। ভবিষ্যতে সেই দয়া, অনুগ্রহ, সহানু-ভূতি হইতে "নব্যভারত" বঞ্চিত হইবে না, সেই আশায় বুক বাঁধিয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছি।

* * *

৺সুরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বৎসরটা বাঙ্গলাদেশকে আরো একটী রত্নহীন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। দরিদ্রের বন্ধু লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক সুরেশচন্দ্র, বিগত ১৭চৈত্র, ইংরাজী ৩০শে মার্চ্চ, বুধবার, পূর্ব্বাহ্নে ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ভগবান পরলোক-গত আত্মাকে শান্তি ও তদীয় পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা বিধান করুন।

* * *

স্বাগত লর্ড রেডিং। বিগত ২০শে চৈত্র, ইংরাজী ২রা এপ্রিল, ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড

চেমসফোর্ড, পাঁচ বৎসর কাল, ভারতের শাসন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি মহামান্য সার রুফাস ড্যানিয়েল আইসাক, পি-সি, জি-সি-বি, জি-সি-এস-আই, জি-সি-আই-ই, কে-সি-ভি-ও, রেডিংয়ের আরল মহোদয়ের হস্তে সেই ভার অর্পণ করিয়া বিদায় লইয়াছেন। ভারতে পদার্পণ করার পরে, বোম্বাই মিউনিসিপালিটি হইতে নূতন বড়লাট বাহাদুরকে অভিনন্দিত করা হয়। সেইকালে, তাঁহার উক্তি হইতে বিচার করিতে হইলে, আশা করা যাইতে পারে, নব-লাটের অধীনে শাসন-কার্য্য নূতন-ভাবে পরিচালিত হইবে। তিনি বলিয়াছিলেন—

* * * I shall set out cheered and encouraged by your welcome with hopefulness in my heart and mainly because all my experience of human beings and human affairs has convinced me that justice and sympathy never fail to evoke responsive chords in the hearts of men of whatever race, creed or class. They are two brightest gems in any diadem. Without them, there is no lustre in a crown. With them, there is a radiance that never fails to attach loyalty and affection. You draw attention to the close approximation of the views expressed by that great Indian—Dadabhoy Naroji—whom I had the honour to know, with love enunciated by me from my seat as Lord Chief Justice, when taking leave of the Bench and Bar. It is true that as Viceroy, I shall be privileged to practise justice in larger fields than in the Courts of Law, but the justice now in my charge is not confined within statutes or law reports. It is justice that is unfettered and has regard to all conditions and circumstances and should be pursued in close alliance with sympathy and understanding. Above all, it must be regardless of distinctions and rigorously impartial. The British reputation for justice must never be impaired during my tenure of office and I am convinced that all who are associated in the Government and administration of Indian affairs will strive their utmost to maintain this reputation at its highest standard. এভাবের উক্তির বিরুদ্ধে কাহার কিছুই বলিবার থাকিতে পারে না। এই ভাষায় না হউক, পূর্ব্বেও, এই প্রকার সাধু সঙ্কল্পের সু-সমাচার (gospel) ভারত পাইয়াছে। কাজে কতটা দাঁড়ায়, তাহাই দেখা দরকার। ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ,—'যে যায় বনে, সেই হয় বন বিড়াল'। তবে লর্ড রেডিং স্বয়ং সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিয়া, নিজে সকল ব্যাপারের 'আসল হাল' বুঝিয়া মতামত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য প্রকাশ বা নির্দ্ধারণ করিবেন, বলিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস, অনাবিল ভাবে পরিচালিত হইলে,—নানা প্রকারের বৈষম্যপূর্ণ বিষয় আসিয়া তাঁহার নিম্মলতাকে ক্ষুন্ন না করিলে,—শাসন-স্রোত নির্ব্বিবাদে অগ্রসর হইয়া দেশের সর্ব্ব-প্রকার মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। ভারতবাসীর অতীতের অভিজ্ঞতা কিন্তু এতদূর আশা রাখে না। মহামান্য বড়লাট কিন্তু ভারতে পদার্পণের অব্যবহিত পরেই, দারুণ অত্যাচার-প্রপীড়িত পাঞ্জাব-প্রদেশ পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, শুভ লক্ষণ। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে নবলাট বাহাদুরকে সসম্ভ্রমে সম্বর্দ্ধনা ও অভিবাদন করি। তাঁহার সৎ সঙ্কল্প শুভফল-প্রসূ হোক; দেশের ও দশের দুঃখ দারিদ্র্য বিমোচিত হউক, সর্ব্বোপরি প্রাণের গভীর ক্ষোভ, নিদারুণ মর্ম্মবেদনা, বহুকাল-ব্যাপী ভীষণ অত্যাচার-পীড়া নিরাকৃত হোক। তাহার জয় জয়কার হোক।

আস্ফালন। 'যত গর্জ্জে, তত বর্ষে না'—এর মানবের পক্ষে বড় কম সৌভাগ্যের কথা

নয়। হেলি সাহেবের ইচ্ছানুরূপ ডাক-মাশুল বৰ্দ্ধিত হইলে, দেশে সাহিত্য চৰ্চ্চার মূলে কুঠারাঘাত হইত। 'যথা পূৰ্ব্বং তথা পরং' হইয়াছে. কেবল এক তোলা ওজনের চিঠি তিন পয়সার কমে যাইবে না। ভালোয় ভালোয় এ 'ফাঁড়া'টা যে অল্পের উপর দিয়া কাটিয়াছে, কপালের ভাগ্য।

* * *

লোকগণনা। আদম-সুমারির গণনা-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এখন স্থূলভাবে লোক-সংখ্যার হিসাব পাওয়া গিয়াছে। বিবিধ অনুপাতে বিচার করিয়া ইহা হইতে বহু বিচিত্রতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। তাহার ফল প্রকাশিত হইতে এখনও কিছুকাল লাগিবে। কিন্তু বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার হিসাব মোটের উপর সন্তোষ-জনক বলা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় জেলার গণনা-ফল নিম্নে দিতেছি—

	১৯১১ হিসাব।	১৯২১ হিসাব।
বীরভূমি	৯,৩৫,৬৬৫,	৮,৪৭,০০৮
ফরিদপুর	২১,৪৫,৮৫১	২২,৫৮,৮০৮
নদীয়া	১৬,১৭,৪৬২	১৪,৮৬,১১১
মুর্শিদাবাদ	১৩,৭২,২৭৪	১২,৬৪,২০৭
মেদিনীপুর	২৮,২১,২০১	২৬,৬১,১৯২
মালদহ	১০,০৪,১৫৯	৯,৯৯,০৯৫
দারজিলিং	২,৬৫,৫৫০	২,৮১,৫৩৫

সমগ্র ভারতের লোক-গণনার ফলে দেখা যায়—১৯২১ খৃষ্টাব্দে মোট জন-সংখ্যা ৩১৯,০৭৫,১৩২ ; তাহার মধ্যে পুরুষ ১৬৪,০৫৬,১৯১ , স্ত্রীলোক ১৫৫,০১৮,৯৪১। এই সংখ্যা, পূৰ্ব্ব-সুমারির সহিত তুলনা করিয়া বুঝা যায়, ১৯০১ হইতে ১৯১১ পর্য্যন্ত এই দশ বৎসরে শতকরা ৭'১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু, ১৯১১ হইতে ১৯২১ পর্য্যন্ত দশ বৎসরে কেবল মাত্র শতকরা ১'২ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। এই প্রকার হিসাবে, ভারতের সমগ্র প্রাদেশিক জন-গণনায় পূৰ্ব্ব দশ বৎসরের শতকরা বৃদ্ধির হার দেখা যায় ৫'৫, বৰ্ত্তমান দশ বৎসরে কিন্তু কেবল, ১'৩। এই লোক সংখ্যা হ্রাস-গতির কারণ কি, বিবেচনার বিষয়। অপর অপর দেশের অনুপাতে, ইহা ভয়াবহ। আদম সুমারির ব্যয়-নিৰ্ব্বাহের জন্য, মোট ২৪,৬৫,০০৯৲ টাকা ভারত গভর্ণমেণ্ট নিৰ্দ্ধারণ করেন।

* * * * * *

চিত্রগুপ্তের খাতা। আদম সুমারির ফলে যাহা বিবেচনার জন্য উক্ত হইল, তাহা আরো সুস্পষ্ট হইবে, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের মিউনিসিপ্যাল বিভাগ হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত ১৯১৯ সনের জন্ম-মৃত্যুর তালিকা পাঠে। ইহাতে প্রকাশ, মোট জন্ম-সংখ্যা হইতে ঐ বৎসর মৃত্যু-সংখ্যা, ৩,৯০,০০০ বেশী , কলেরায়, ১,২৫,০০০ ; বসন্তে, ৩৭০০০ ; জ্বরে, ১২,২৯,০০০। বৎসর বৎসর এই হারে যদি আমদানি (জন্ম) কম, ও রপ্তানি (মৃত্যু) বেশী হইতে থাকে, পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, দেউলিয়ার পূর্ণ-লোপ।

* * *

বঙ্গে পুলীশ-ব্যয়। লোক আগে বাঁচুক, তবে ত তাহাকে রক্ষার আয়োজন, তাহাই বিচক্ষণতার কাজ। লোক-ই যদি না থাকে, কোথায় থাকিবে রাজ্য, রাজ্য-শাসন, শাসন-রক্ষা। এইজন্য, সর্ব্বপ্রথমে যে সকল কারণে লোক-সংখ্যা উত্তর উত্তর হ্রাস পাইতেছে, তাহা নিরাকরণ করিবার সুব্যবস্থা করাই প্রকৃত স্বার্থ। বঙ্গীয়-শাসন-প্রণালী কিন্তু অন্যরূপে পরিচালিত। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের জন্য ১৮২১ ২২ খ্রীষ্টাব্দে বরাদ্দ আছে—

	প্রজার ইচ্ছাসাপেক্ষ	তদবহির্ভূত	মোট	পূর্ব্ববৎসর হইতে বৃদ্ধি
চিকিৎসা—	৪৫,০২,০০০	৭,১২,০০০	৫২,২৪,০০০	+ ১৫,৩০,০০০
সাধারণ স্বাস্থ্য—	১৮,৫০,০০০	৯৬,০০০	১৯,৪৬,০০০	+ ?,৫০,০০০
মোট টাকা—	৬৩,৬২,০০০	৮,০৮,০০০	৭১,৭০,০০০	+১৫,৪০,০০০

ইহার মধ্যে হইতেই যাবতীয় হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, ডাক্তার ও লোকজন সকলের ব্যয়-নির্ব্বাহ হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড অথবা মিউনিসিপালিটির ডাক্তার-খানার ব্যয় অবশ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত নয়। পুলিশ-বিভাগের ব্যয়ের বরাদ্দের বহর, এই ব্যয়ের তুলনায়, কত বৃহৎ দেখুন—

	প্রজার ইচ্ছাধীন	তদবহির্ভূত	মোট	পূর্ব্ববৎসর হইতে বৃদ্ধি
সদর পুলীশ—	৩২,৪১,০০০	৯৬,০০০	৩৬,৩৭,০০০	+ ৮,২৭,০০০
তত্ত্বাবধান—	২,৪২,০০০	১,৪৭,০০০	৩,৮৯,০০০	—১৩,০০০
জেলা পুলীশ—	১,২০,১৪,০০০	১০,৭৪,০০০	১,৩০,৮৮,০০০	+ ১৭,৮৮,০০০
বিশেষ পুলীশ—	৪,০০,০০০	১,৭৯,০০০	৫,৭৯,০০০	+ ১,৪৪,০০০
রেল পুলীশ—	৬,৭৯,০০০	৩৬,০০০	৭,১৫,০০০	—৭০০০
গোয়েন্দা পুলীশ—	৬,২০,০০০	৫২,০০০	৬,৭২,০০০	+ ২১,০০০
খোঁয়াড়—	০	৩০০	৩০০	৩০০
প্রত্যাপণ—	০	৬,৭০০	৬,৭০০	—৩০০
মোট টাকা	১,৭৫,০০,৭০০	১৫,৪৮,৩০০১	১,৯০,৬৫,০০০	+ ২৭,৬০,০০০

* ইহার মধ্যে কিন্তু বিবাহিত-পুলীশ-সর্জ্জেণ্টের ইমারতের জন্য জমি ক্রয়ের খরচ নাই। চিকিৎসা ও সাধারণ স্বাস্থ্যের বিভাগ গণ-তন্ত্রের শাসনাধীন, পুলীশ-বিভাগ কিন্তু তাহা নয়। সে বিভাগে আমলা-তন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য। প্রজার এই বিভাগের ব্যয়-সংক্ষেপ করিবার প্রস্তাব মাত্র করিবার ক্ষমতা আছে। ব্যয় কমাইয়া দিলে, গভর্ণর, সে ক্ষমতার বলে, কোন রক্ষিত-বিষয়ে (reserved subject) কোন বিভাগের পরিচালনের জন্য (অবশ্য-প্রয়োজন বিবেচনা করিলে,) সেই ব্যয় প্রত্যর্পণ (restore) করিতে পারেন। প্রজা-তন্ত্রের উপরে ন্যস্ত শাসন-বিভাগের আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা-বিষয়ে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তার পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা নাই, সে বিষয়ে, প্রজার প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য-মণ্ডলীর অধিকাংশের মতই চরম। পুলীশ-বিভাগের এই ব্যয়বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভায়, বে-সরকারী সদস্যগণ তুমুল আন্দোলন করিয়া ব্যয় হ্রাস করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাহার প্রয়োগে, যতটুকু পারা যায়, অন্যায়ের প্রতিবিধান করিতে প্রয়াসী হওয়াই বিধেয়। ফলে কিছু না দাঁড়াক, তাও ভাল; চেষ্টার ত্রুটী না হয়, তাহাই দেখা উচিত। ঘোরতর আন্দোলনের ফলে, বে-সরকারী সভ্যমণ্ডলী মোটমাট ২৩৩৪,০০০ টাকা পুলীশ-বজেট হইতে কমাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর, আমলা-তন্ত্রের মধ্যে মহা হুলুস্থূল পড়িয়া যায়; কি উপায়ে এই প্রকার বে-সরকারী সদস্য-মণ্ডলীর বে-আদবীর প্রতিকার করা যায়, নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে। বে-

সরকারী সদস্য-মণ্ডলীর মধ্যেও প্রজাগণের প্রতিনিধি এমন লোকের অভাব নাই, যাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা, আমলা-তন্ত্রের পৃষ্ঠ-পোষণ। এই নীতি অবলম্বনে, তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষতি ত কিছুই নাই, বরঞ্চ লাভের আশা আছে, বিস্তর। সে যাহা হউক, এই প্রকার ব্যয়-হ্রাসের প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরেই, আমলা-তন্ত্রের পৃষ্ঠ-পোষক কোন কোন সদস্য, লাট-বাহাদুরের নিকটে নিবেদন করিলেন, এই প্রকার ব্যয়-সংক্ষেপ করিয়া গর্হিত-কর্ম্ম করিয়াছেন, অবসর পাইলেই পুনর্বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে রাজী আছেন। উপায় উদ্ভাবিত হইল, প্রশ্নটী পুনরায় বিবেচিত হইবে, নির্দ্ধারিত হইল। সে ঘটনা জটিল, প্রহেলিকা-পূর্ণ। বাহুল্য-ভয়ে সে আলোচনা আজ স্থগিত রাখিতে হইল।

এই প্রকারে কার্য্য-প্রণালী সম্পন্ন হইবার পর, বঙ্গের লাট বাহাদুর ব্যবস্থাপক সভার মুলতুবি করিবার প্রসঙ্গে, বিগত ৮ই এপ্রিল, ১৯২১ তারিখে, সভাস্থলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া,—গুরু যেমন পোড়োদের তিরস্কার করিয়া থাকেন,—সেই প্রকার একপ্রস্থ তাড়না করেন। তাহাতে, শাসন-নীতি ও তন্ত্রের বিধি-ব্যবস্থার শাস্ত্রার্থ-মূলক বহুল কূট-তর্কের প্রবর্ত্তন করেন। বিশেষ ইচ্ছাসত্বেও, স্থানাভাবে, তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

তাহার পর পুলীশ বজেট সম্বন্ধে তিনি বলেন—If I have rightly understood them (proceedings), it is your desire to give further consideration to the question of the amount which you may deem necessary for the proper maintenance of an adequate police-force in the light of any further information which Government may be able to give you * * * I shall certainly take steps to accede to *the request made to me* in the course of the debate on Friday last (1st April 1921) to provide you with *the opportunity for which you ask*, further to discuss the matter। এই 'সুযোগ' দেওয়া হইয়াছিল বিগত ২০শে ও ২১শে এপ্রিল তারিখে। সেই দিন, এই বিভাগের ব্যয়ের জন্য মোট ২২,৯৭,১০০ টাকা চাওয়া হয়; পূর্ব্বে বলিয়াছি, কমান হইয়াছিল, ২৩,৩৩,০০০ টাকা, বাকী মোট ৩৬,৩০০৲ ফাজিল যোগের ভুল হইয়াছিল, প্রকাশ পায়, তাই সংশোধিত দাবী-ভুক্ত হয় নাই। খুব ফস্‌কাইয়া গিয়াছে। লাটবাহাদুর যাহার কথা বলিয়াছিলেন, সেই প্রতিশ্রুত তথ্য, ১৮ই এপ্রিল প্রস্তুত হয় এবং কোন কোন বে-সরকারী সভ্যের নিকটে সভার নির্দ্ধারিত দিনের (২০শে এপ্রিলের) প্রাতে নয়টার সময় পৌছে। আমাদের ধারণা, দয়া-পরবশ হইয়া, আমলা-তন্ত্র এই যে তথ্য দিয়াছিলেন, তাহা হইতে এই দাবী না-মঞ্জুর করিলে যে বিভাগটী একেবারে অচল হইয়া পড়ে, সে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ব্যবস্থাপক-সভার মত যে এই তথ্য প্রকাশের জন্যই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সে বিশ্বাস আমাদের মোটেই নাই। ইহা প্রকাশ না হইলেও যাহা হইত, প্রকাশিত হইবার পরেও তাহাই হইয়াছে। আমাদের মতে, প্রথমতঃ ভারত-শাসন-বিধির ব্যবস্থা অনুসারে এই, প্রকারের, সংশোধিত ব্যয়ের দাবী হইতে পারে কি না, সন্দেহের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবস্থাপক সভা একবার কোন রক্ষিত বিষয়ের আয় ব্যয় সম্বন্ধে বিচার করিলে পর, আবার পুনর্বিবেচনা করিবার ক্ষমতা পাইতে পারেন কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয়। তৃতীয়তঃ, ব্যবস্থাপক সভার মতামত প্রকাশ করার'পরে, সেই বিষয়ে দায়ীত্ব সম্পূর্ণরূপে লাট বাহাদুরের উপরে পড়ে; তিনি হয়, তাঁহার স্বায়ত্বাধীন বিভাগ, যতটাকা মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা দ্বারা কায়ক্লেশে পরিচালন করিতে পারেন; না হয়, 'অসঙ্কুলান হইলে, স্বীয় ক্ষমতার ব্যবহার দ্বারা, প্রয়োজন-মত না-মঞ্জুর টাকার ব্যয় মঞ্জুর করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রচেষ্টা না করিয়াই, লাট বাহাদুর নামঞ্জুর ব্যয়ের পুনর্বিবেচনার জন্য, পুনরায় ব্যবস্থাপক-সভার